সালাতে একাগ্রতা অর্জনের ৩৩টি উপায়

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

৯০৩

অনুবাদ: সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

33 سببا للخشوع في الصلاة

الشيخ محمد صالح المنجد

ترجمة: ثناء الله نذير أحمد

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচীপত্র

ভূমিকা

দোজাহানের রব আল্লাহ তা'আলার জন্যে যাবতীয় প্রশংসা, যিনি সালাতে একাগ্রতাসহ ও বিনীতভাবে দাঁড়ানোর পরিষ্কার নির্দেশ দিয়ে মহান গ্রন্থ কুরআনুল কারিমে বলেছেন,

﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]

"তোমরা আল্লাহর জন্যে বিনীতভাবে দাঁড়াও।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৩৮] অপর আয়াতে তিনি সালাত সম্পর্কেই বলেছেন,

﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ ٤٥﴾ [البقرة: ٤٥، ٤٦]

"নিশ্চয় সালাত অনেক কঠিন তবে একাগ্রচিত্তদের (খুশুর ধারকদের) ওপর নয়।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৪৫-৪৬]

সালাত ও সালাম নাযিল হোক মুত্তাকিদের ইমাম ও খুশুর ধারকদের আদর্শ ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদের ওপর, তার পরিবার এবং সকল সাহাবীর ওপর।

প্রিয় পাঠক, ইসলামের ইবাদত প্রধানত দু'প্রকার: করণীয় ও বর্জনীয়। সালাত করণীয় শ্রেষ্ঠ ইবাদত। আর খুশু হচ্ছে তার প্রাণ ও সৌন্দর্য। কাজেই শরীআত তা রক্ষার জন্যে কড়া নির্দেশ দিয়েছে, তবে **যেহেতু** আল্লাহর শত্রু শয়তান আদম সন্তানকে পথভ্রষ্ট ও ফিতনায় নিমজ্জিত করার শপথ করে এসেছে এবং জেদ করেই বলেছে,

﴿ثُمَّ لَأٓتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيۡنِ أَيۡدِيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ وَعَنۡ أَيۡمَٰنِهِمۡ وَعَن شَمَآئِلِهِمۡۖ وَلَا تَجِدُ أَكۡثَرَهُمۡ شَٰكِرِينَ ١٧﴾ [الاعراف: ١٧]

"তারপর অবশ্যই আমি তাদের নিকট আসব, তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান থেকে ও তাদের বাম থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৭] **সেহেতু** তার ষড়যন্ত্রের প্রথম ধাপ হচ্ছে বিভিন্ন উপায়ে তাদেরকে সালাত থেকে বিমুখ করা এবং তাতে বিভিন্ন ওয়াসওয়াসা দেওয়া, যেন তার স্বাদ থেকে তারা বঞ্চিত হয় এবং তাদের সাওয়াবও নষ্ট হয়।

আরেকটি বাস্তবতা হচ্ছে, কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবী থেকে সবার আগে তুলে নেওয়া হবে সালাতের খুশু ও একাগ্রতা আর আমরা কিয়ামতের পূর্বের যুগেই বাস করছি। তাই আমাদের মধ্যে হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর আশঙ্কা দুঃখজনকভাবে সত্যে পরিণত হয়েছে! তিনি

বলেছেন,

«أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورُبَّ مصلٍّ لا خير فيه، ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعًا».

"তোমরা তোমাদের দীন থেকে প্রথম হারাবে সালাতের একাগ্রতা (খুশু), আর সবশেষে হারাবে সালাত। এমনও মুসল্লি থাকবে যার ভেতর কোনো কল্যাণ থাকবে না। তুমি অতি শীঘ্রই মসজিদে প্রবেশ করবে, কিন্তু তাদের একজনকেও একাগ্রচিত্ত পাবে না।"[1]

অধিকন্তু সালাতে নানা কল্পনার উদ্রেক হওয়া, তাতে একাগ্রতা না থাকা প্রভৃতি অভিযোগ মুসল্লি নিজের ভেতর অনুভব করে এবং তার পাশের বহু লোক থেকেও শ্রবণ করে, তাই সেটা দূর করার লক্ষ্যে 'সালাতে একাগ্রতা অর্জনের ৩৩টি উপায়' উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি, যেন আমার ও আমার মুসলিম ভাই-বোনের জন্যে কল্যাণকর হয়। আল্লাহর নিকট দো'আ করি তিনি সবাইকে গ্রন্থখানি দ্বারা উপকৃত করুন।

আল্লাহ তা'আলা সূরা মুমিনুনের শুরুতে সফল মুমিনদের গুণাবলি উল্লেখ করেছেন, প্রথমেই বলেছেন সালাতে খুশু ও একাগ্রতার কথা, যেমন:

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢﴾ [المؤمنون: ١، ٢]

"মুমিনগণ সফল, যারা তাদের সালাতে একাগ্র (খুশুওয়ালা)।" [সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: ১-২]

ইবন কাসীর রহ. আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, "আল্লাহ ভীরু ও একাগ্রতাসম্পন্ন মুমিনরা সফল। আর একাগ্রতা (খুশু) বলা হয় আল্লাহর প্রতি গভীর মনোযোগ ও তার ভয় থেকে সৃষ্ট ধীরতা, স্থিরতা, ধৈর্য, গম্ভীরতা ও বিনয়াবনতাকে।"[2]

অন্য কেউ বলেন: "বিনয়াবনত ও অন্তরের অবনত ভাব নিয়ে আল্লাহর সমীপে দাঁড়ানোকে একাগ্রতা (খুশু) বলা হয়।"[3]

তাবেয়ি মুজাহিদ রহ. আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] [তোমরা আল্লাহর জন্যে কুনুতের অবস্থায় (বিনীতভাবে) দাঁড়াও।] এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, "সালাতে সুন্দরভাবে রুকু করা, তাতে খুশু ও একাগ্রতা রক্ষা করা, চোখের দৃষ্টি অবনত রাখা এবং

---

[1] ইবনুল কাইয়্যেম প্রণীত 'মাদারিজুস সালিকিন': ১/৫২১।

[2] ইবন কাসীর প্রণীত 'তাফসির': ৬/৪১৪, 'দারুশ-শা'আব' প্রকাশিত।

[3] ইবনুল কাইয়্যেম প্রণীত 'মাদারিজুস সালিকিন': ১/৫২০।

আল্লাহর ভয়ে বিনয়ী শরীর নিয়ে দাঁড়ানোকে কুনুতের অবস্থা বলা হয়।”[4]

ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, “খুশুর স্থান অন্তর, তবে তার আলামত স্পষ্ট হয় গোটা শরীরে। কারণ, শরীর অন্তরের অনুসারী, তাই গাফিলতি ও ওয়াসওয়াসার জন্যে যখন অন্তরের আমল খুশু ও একাগ্রতা নষ্ট হয় তখন বাহিরের আমল বিনয়-নম্রতাও নষ্ট হয়। কেননা, অন্তর বাদশাহ আর অঙ্গসমূহ আজ্ঞাবহ সৈনিকের মতো। বাদশাহর নির্দেশে সৈনিকেরা চলে ও সামনে অগ্রসর হয়। যদি খুশু না থাকার দরুন অন্তরনামী বাদশাহর পতন ঘটে, তাহলে তার প্রজাদের ধ্বংস অনিবার্য। হ্যাঁ, কেউ যদি অন্তরে খুশু ধারণ না করে স্রেফ দেখানোর জন্যে বাহিরে খুশুর আলামত প্রকাশ করে, তবে সেটা অবশ্যই নিন্দনীয়, বস্তুত খুশুর আলামত প্রকাশ না করাই ইখলাস।

হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, ‘কপট খুশু থেকে বিরত থাক। জিজ্ঞেস করা হলো, কপট খুশু কী? তিনি বললেন, বহিরঙ্গে খুশু দেখানো যদিও অন্তরঙ্গ খুশুবিহীন।’

ফুদায়েল ইবন আয়াদ্ব রহ. বলেন, ‘আগেকার যুগে অন্তরঙ্গে যে পরিমাণ খুশু আছে বহিরঙ্গে তার চেয়ে বেশি প্রকাশ করাকে ঘৃণার চোখে দেখা হতো।’

জনৈক আলেম কোনো এক ব্যক্তির শরীর ও কাঁধে খুশুর আলামত দেখে বললেন: হে ছেলে, খুশু এখানে নয়—কাঁধের দিকে ইশারা করে। আর বুকের দিকে ইশারা করে বললেন, খুশু এখানে।”[5] সংগৃহীত অংশ শেষ হলো।

ইবনুল কাইয়্যেম রহ. ঈমানের খুশু ও নিফাকের খুশুর মাঝে পার্থক্য নির্ণয়ে বলেন, “ঈমানের খুশু হচ্ছে আল্লাহর সম্মান, বড়ত্ব, গম্ভীরতা, ভয় ও লজ্জা থেকে সৃষ্ট বান্দার অন্তরের একাগ্রতা। এরূপ একাগ্রতার ফলে বান্দার অন্তর আল্লাহর ভয় ও মহত্ত্বে চুপসে যায় এবং নিজের দেহে তার নিআমত দেখে ও নিজের কৃত অপরাধ স্মরণ করে আরো কৃতজ্ঞ ও লজ্জিত হয়। আর এই বিনয় মিশ্রিতই ভাবকে সঙ্গ দেয় দেহের বাহ্যিক অঙ্গসমূহ। অপরপক্ষে নিফাকের খুশু লোক দেখানো ও কপটতা হেতু যদিও বহিরঙ্গে দেখা যায় কিন্তু অন্তরঙ্গ থাকে নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন। জনৈক সাহাবী বলতেন: ‘আল্লাহর নিকট নিফাকের খুশু থেকে পানাহ চাই; তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, নিফাকের খুশু কী? তিনি বললেন, শরীরে একাগ্রতা প্রকাশ করা যদিও অন্তর একাগ্রতাহীন।’

প্রকৃত অর্থে খুশু ও একাগ্রতা তার সালাতেই অর্জন হয়, যার প্রবৃত্তির আগুন নিভে গেছে, বুক থেকে তার ধোঁয়া বেরোনো বন্ধ হয়েছে, ফলে তার ভেতরটা উজ্জ্বল, হৃদয়টা সম্প্রসারিত এবং দেহটা হয় আল্লাহর বড়ত্বের দ্যোতিতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। ইতোপূর্বে যে প্রবৃত্তি তাকে

---

[4] মুহাম্মাদ ইবন নাসর আল-মারওয়াযি সংকলিত ‘তাজিমু কাদরিস সালাত’: ১/১৮৮।

[5] ইবনুল কাইয়্যেম প্রণীত ‘মাদারিজুস সালিকিন’: ১/৫২১।

ঘিরেছিল, সে এখন হাত-পা বাঁধা, নিশ্চল, আল্লাহর ভয় ও গম্ভীরতায় নিস্তব্ধ, ফলে তার অন্তরটা আল্লাহতে নিবিষ্ট এবং তার তাওফিকে তাকেই স্মরণ করছে অনবরত। দিগ্বিদিক থেকে গড়িয়ে আসা মেঘের পানি ধারণ করে উপত্যকা যেরূপ সিক্ত হয়, তার মতো সেও অঙ্গে-অঙ্গে আল্লাহর বড়ত্ব চুষে পরিতৃপ্ত। তারপর আল্লাহর মহত্ত্বে আবেগাপ্লুত হয়ে বিনয়ী ও ভঙ্গুর হৃদয় নিয়ে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে, যতক্ষণ না তার সাক্ষাত পায় মাথা তুলে সোজা হয় না। এটাই ঈমানের খুশু ও একাগ্রতা। পক্ষান্তরে দাম্ভিকের অন্তর দম্ভে স্ফীত, অবাধ্য, অন্যায় কামী ও উচ্ছৃঙ্খল, ঠিক যেন পাথুরে পর্বত, তাতে পানি জমে না এবং তার থেকে ফসলও উৎপাদিত হয় না। তার সালাতে দাঁড়িয়ে মরার ভান করা ও শরীরের কপট স্থিরতা দ্বারা লোক দেখানো খুশু সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু তার ভেতরে নফস পুরো যুবক, চাহিদা ও প্রবৃত্তিতে নিমজ্জিত। সে বাহ্যিকভাবে খুশুর ভান করে, কিন্তু তার দু'পাশ থেকে ঝোপের সাপ ও জঙ্গলের বাঘ তাকে শিকার করতে ওঁত পেতে থাকে।”[6] সংগৃহীত অংশ শেষ হলো।

ইবন কাসীর রহ. বলেন, “কেবল তার সালাতে খুশু ও একাগ্রতা অর্জন হয়, যে নিজের অন্তরকে তার জন্যে অবসর করে, সবকিছু ত্যাগ করে তাকে নিয়ে মগ্ন হয় এবং সবকিছুর উপর তাকে প্রাধান্য দেয়। আর একাগ্রতা সম্পন্ন সালাতই আত্মার প্রশান্তি ও চোখের শীতলতা হয়। যেমন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম আহমদ ও নাসাঈর বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وجعلت قرة عيني في الصلاة».

‘আমার চোখের প্রশান্তি করা হয়েছে সালাতে।”[7]

আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারিমের যেখানে স্বীয় মনোনীত বান্দাদের গুণ বর্ণনা করেছেন সেখানে খুশুর সাথে সালাত আদায়কারী নারী-পুরুষকেও উল্লেখ করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন,

﴿أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةً وَأَجۡرًا عَظِيمًا ٣٥﴾ [الاحزاب: ٣٥]

“আল্লাহ তাদের জন্যে ক্ষমা ও মহান প্রতিদান নির্ধারণ করেছেন।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৫]

খুশু সালাতকে বান্দার ওপর হালকা করে দেয়। এটা খুশুর আরেকটি ফায়দা, আল্লাহ তা‘আলা

[6] ইবনুল কাইয়্যেম প্রণীত ‘আর-রুহ’: পৃ.৩১৪, ‘দারুল ফিকর’, জর্ডান (উর্দুন)।

[7] ইবন কাসীর প্রণীত ‘তাফসির’: ৫/৪৫৬, হাদীসটির জন্যে আরো দেখুন: ‘সহীহ আল-জামি’: হাদীস নং ৩১২৪।

বলেন,

﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ ٤٥﴾ [البقرة: ٤٥]

"তোমরা ধৈর্য ও সালাতের দ্বারা সাহায্য চাও, নিশ্চয় তা খুশুর ধারক ছাড়া অন্যদের ওপর কঠিন।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৪৫]

ইবন কাসীর রহ. আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, "অর্থাৎ সালাত বড় কষ্টের কাজ, তবে খুশুওয়ালাদের জন্যে তাতে কোনো কষ্ট নেই।"[8]

খুশুর গুরুত্ব অনেক। খুশু খুব কষ্টে অর্জন হয়, আবার প্রস্থান করেও দ্রুত। বর্তমান যুগে খুশুর খুব অভাব, বিশেষভাবে যেহেতু এটা শেষ যুগ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعا».

"এ উম্মত থেকে প্রথম উঠিয়ে নেওয়া হবে খুশু, ফলে তুমি তাদের ভেতর কাউকে খুশুওয়ালা দেখবে না।"[9]

কতক সালাফ বলেছেন, "সালাত হচ্ছে দাসীর মতো, যা বাদশাহদের বাদশাহকে উপহার দেওয়া হয়। অতএব যে বাদশাহকে পঙ্গু, বা কানা, বা অন্ধ, বা হাত-পা কাঁটা, বা অসুস্থ, বা বিশ্রী, বা কুৎসিত, এমন কি মৃত দাসী উপহার দেয়, তার প্রতি বাদশাহের কী আচরণ আশা কর? অনুরূপভাবে যে সালাত বান্দা তার রবকে উপহার দেয় এবং যে সালাত পেশ করে রবের নৈকট্য প্রত্যাশী হয়, সে সালাতটি গুণে-মানে কেমন হওয়া উচিত? মনে রাখবেন, আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র আমল ছাড়া গ্রহণ করেন না, আর যে সালাত খুশুহীন সেটা পবিত্র সালাত নয় বলাই বাহুল্য। যেমন মৃত দাস মুক্ত করা সদকার ক্ষেত্রে পবিত্র সদকা নয়, তেমন খুশুহীন সালাত আমলের ক্ষেত্রে পবিত্র আমল নয়।"[10] সংগৃহীত অংশ শেষ হলো।

একাগ্রতার হুকুম

সালাতে খুশু ওয়াজিব কি না আলেমগণ মতভেদ করেছেন, তবে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী খুশু ওয়াজিব। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহ. বলেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

[8] ইবন কাসীর প্রণীত 'তাফসির': ১/১২৫।

[9] মুহাদ্দিস হায়সামি সংকলিত 'আল-মাজমা': ২/১৩৬; তিনি বলেন, "ইমাম তাবরানি 'আল-কাবির' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার সনদটি হাসান।" আরো দেখুন, 'সহীহ আত-তারগিব ও আত-তারহিব', হাদীস নং ৫৪৩, আলবানি হাদীসটি সহীহ বলেছেন।

[10] ইবনুল কাইয়্যেম প্রণীত 'মাদারিজুস সালিকিন': ১/৫২৬।

﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ ٤٥﴾ [البقرة: ٤٥]

“তোমরা ধৈর্য ও সালাতের দ্বারা সাহায্য তলব কর, নিশ্চয় তা অনেক কঠিন, তবে খুশুর ধারকদের ওপর নয়।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৪৫]

এ আয়াতের দাবি হচ্ছে, সালাতে খুশুহীনেরা নিন্দাযোগ্য। কারণ, ওয়াজিব পরিত্যাগ ও হারামে লিপ্ত হওয়া ছাড়া এভাবে কাউকে সাধারণত নিন্দা করা হয় না। কাজেই তাদের নিন্দা করা প্রমাণ করে খুশু ওয়াজিব। অধিকন্তু নিম্নের আয়াত থেকেও প্রমাণিত হয় খুশু ওয়াজিব, যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡوَٰرِثُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلۡفِرۡدَوۡسَ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ١١ ﴾ [المؤمنون: ١، ١١]

‘অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে একাগ্র (বিনয়ী)... তারাই প্রকৃত ওয়ারিস। যারা ফিরদাউসের ওয়ারিস হবে, তারা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে।’ [সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: ১-১১]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, খুশুর ধারক ও বিনয়ীরা জান্নাতুল ফিরদাউসের ওয়ারিস হবে, অর্থাৎ যারা খুশুর ধারক নয় তারা তার ওয়ারিস হবে না। এ থেকেও খুশু ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। আর খুশুর বাহ্যিক আলামত হচ্ছে বিনয় ও ধীরতা। সুতরাং যে কাকের ঠোকর মারার মত সাজদাহ করে, কিংবা রুকু থেকে সোজা না দাঁড়িয়ে সাজদায় ঝাঁপ দেয়, তার সালাতে খুশু নেই। কারণ, সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার একটি শর্ত ধীরতা (ইতমিনান)। অর্থাৎ তার রুকনগুলো ধীরে-সুস্থে আদায় করা। অতএব যার সালাতে শান্তভাব নেই তার ধীরতা নেই, যার ধীরতা নেই তার খুশু নেই, আর যার খুশু নেই তার ওয়াজিব নেই, কাজেই সে ওয়াজিব ত্যাগ করার দোষে দোষী। অধিকন্তু খুশু নষ্ট হবে বলেই সালাতে আসমান দেখতে নিষেধ করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কারণ উপরে চোখ তুলে তাকানো ও অহেতুক নড়া-চড়া করা খুশুর পরিপন্থী। সুতরাং হাদিসের নিষেধাজ্ঞা থেকেও সালাতে খুশু ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়।”[11] সংগৃহীত অংশ শেষ হলো।

একাগ্রতার ফযীলত

একাগ্রতার ফযীলত সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

[11] ইবন তাইমিয়ার ফাতওয়া সংকলন ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’: ২২/৫৫৩-৫৫৮।

«خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل، فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه».

"আল্লাহ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন, যে সুন্দরভাবে ওযু করল এবং যথা সময় তা আদায় করল, রুকু ও একাগ্রতা (খুশু) পূর্ণভাবে আঞ্জাম দিল, তার জন্যে আল্লাহর ওয়াদা যে, তিনি তাকে ক্ষমা করবেন। আর যে এরূপ করল না তার জন্যে আল্লাহর কোনো ওয়াদা নেই। যদি চান তাকে ক্ষমা করবেন, আর যদি চান তাকে শাস্তি দিবেন।"[12]

একাগ্রতা সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يُقبل عليهما بقلبه ووجهه -وفي رواية: لا يحدّث فيهما نفسه- غفر له ما تقدّم من ذنبه -وفي رواية إلا وجبت له الجنة».

"যে ওযু করল এবং ওযুকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করল, তারপর মন ও চেহারার একাগ্রতাসহ দু'রাকাত সালাত পড়ল,—অপর বর্ণনায় এসেছে—, তারপর বিনা ওয়াসওয়াসায় দু'রাকাত সালাত পড়ল, তার বিগত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হলো,—অপর বর্ণনায় এসেছে—, তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হলো।"[13]

একাগ্রতা অর্জনের উপায়গুলো দু'প্রকার

একাগ্রতা (খুশু) অর্জনের উপায়গুলোর উপর গবেষণা ও অনুসন্ধান শেষে জানা গেছে যে, সেগুলো দু'ভাগে বিভক্ত: করণীয় ও বর্জনীয়।

১. করণীয়, যেমন যেসব উপায় গ্রহণ করলে খুশু তৈরি ও শক্তিশালী হয় সেগুলো গ্রহণ করা।

২. বর্জনীয়, যেমন যেসব বাধা বা উপকরণ থাকলে খুশু বিনষ্ট ও দুর্বল হয় সেগুলো বর্জন করা।

শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ রহ. খুশু উৎপাদনকারী উপায় ও উপকরণ প্রসঙ্গে বলেন, "দু'টি জিনিস খুশু উৎপাদন করতে সাহায্য করে, এক. খুশুর সহায়ক উপায়গুলো শক্তিশালী ও সক্রিয় করন, দুই. খুশুর বিপরীত উপকরণগুলো দুর্বল ও নিষ্ক্রিয়করণ।

প্রথমত, খুশু উৎপাদনকারী উপায়গুলোকে শক্তিশালী ও সক্রিয়করণ, যেমন মুসল্লি সালাতে যা

---

[12] আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২৫। আরো দেখুন, ইমাম সুয়ুতি সংকলিত 'আল-জামি' গ্রন্থ হতে ইমাম আলবানি কর্তৃক বিশুদ্ধ সংকলন 'সহীহ আল-জামি', হাদীস নং ৩২৪২।

[13] সহীহ বুখারি, হাদীস নং ১৫৮, 'আলবুঘা' প্রকাশিত। 'সুনানু' নাসাঈ: ১/৯৫ আরো দেখুন, ইমাম সুয়ুতির 'আল-জামি' গ্রন্থ থেকে ইমাম আলবানির বিশুদ্ধ সংকলন 'সহীহ আল-জামি', হাদীস নং ৬১৬৬।

করে ও বলে তা বুঝার চেষ্টা করবে; কিরাত, যিকির ও দো'আর অর্থে চিন্তা করবে; এবং সে আল্লাহর সাথে কথা বলছে স্মরণ করবে। মূলত, মুসল্লি যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন সে আল্লাহর সাথেই কথা বলে। তার প্রমাণ, জিবরিলের হাদিসে ইহসানের ব্যাখ্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

'তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর, ঠিক যেন তাকে দেখছ। যদি তাকে না দেখ, অবশ্যই তিনি তোমাকে দেখছেন।' [বুখারি ও মুসলিম]

ইহসানের সাথে সালাত আদায় করে যখন মুসল্লি তার প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করবে তখন সালাতের প্রতি তার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। বস্তুত, ঈমানের দৃঢ়তা অনুপাতে মুসল্লির ইহসান সৃষ্টি হয়, আর ইহসান অনুপাতে মুসল্লি তার স্বাদ আস্বাদন করে। শরীয়ত এ জন্যেই ঈমান দৃঢ় করার অনেক উপায় বলে দিয়েছে, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

« حبِّب إليَّ من دنياكم النساء والطيب ، وجعلت قرة عيني في الصلاة ».

'তোমাদের দুনিয়া থেকে আমার নিকট প্রিয় করা হয়েছে: নারী ও সুগন্ধি; আর আমার চোখের প্রশান্তি করা হয়েছে সালাতে।' [নাসাঈ, হাদীসটি সহি] অপর হাদিসে তিনি বলেন,

«أرحنا بالصلاة يا بلال».

'হে বেলাল, সালাতের দ্বারা আমাদের প্রশান্তি দাও।' [আবু দাউদ ও আহমদ।] লক্ষ্য করুন, তিনি «أرحنا منها» বলেন নি, যার অর্থ সালাত থেকে স্বস্তি দাও।

দ্বিতীয়ত, খুশুর বাধা ও তার পরিপন্থী বস্তুগুলো দূর করা বা নিষ্ক্রিয় করা, অর্থাৎ যেসব বস্তু অন্তরকে মগ্ন করে ও সালাতের উদ্দেশ্য থেকে বিরত রাখে সেগুলো নিষ্ক্রিয় করা বা সরিয়ে ফেলা, যেমন বাজে জিনিসের চিন্তা ও হৃদয় আকৃষ্টকারী বস্তুর জল্পনা-কল্পনা। কারণ, ব্যক্তি অনুসারে কম-বেশী সবার ভেতর খুশুর বাধা রয়েছে, যেমন যার ভেতর সন্দেহ ও প্রবৃত্তি বেশি তার ভেতর ওয়াসওয়াসা বেশী। স্বভাবত, অন্তরে যে পরিমাণ প্রিয় বস্তুর টান ও অপ্রিয় বস্তুর অনীহা থাকবে সে পরিমাণ তাতে ওয়াসওয়াসার উদ্রেক হবে।"[14] সংগৃহীত অংশ শেষ হলো।

উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হলো যে, খুশু ও একাগ্রতার সহায়ক উপায়গুলো দু'প্রকার: করণীয় ও বর্জনীয় কিংবা উৎপাদনকারী ও বিনষ্টকারী। নিম্নে এ সম্পর্কে কুরআন, হাদীস ও সালাফদের আদর্শ অনুসারে সামান্য আলোচনা পেশ করছি।

[14] ইবন তাইমিয়ার ফাতওয়া সংকলন 'মাজমুউল ফাতাওয়া': ২২/৬০৬-৬০৭।

প্রথমত, একাগ্রতা অর্জনের করণীয় উপায়সমূহ

১. সালাতের জন্যে পূর্ব থেকে প্রস্তুত হওয়া, উদাহরণত মুয়াজ্জিনের সাথে আযানের শব্দগুলো বলা এবং আযান শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত দো'আ পাঠ করা, যেমন:

«اللَّهُمَّ رَبَّ هذه الدَّعْوةِ التَّامَّةِ، والصَّلاَةِ القَائِمَةِ، آتِ محمداً الوَسِيْلَةَ والفَضِيْلَةَ، وابْعَثْهُ مَقاماً مَحْمُوداً الذي وَعَدْتُه».

"হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ দাওয়াত ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের রব। আপনি মুহাম্মাদকে ওসিলা ও ফযীলত দান করুন এবং তাকে 'মাহমুদ মাকাম'-এ (প্রশংসিত স্থানে) পৌঁছে দিন, যার ওয়াদা আপনি তাকে দিয়েছেন।"

আযান ও ইকামতের মাঝে দো'আ করা, বিসমিল্লাহ বলে ওযু শুরু করা, সুন্দরভাবে ওযু করা এবং ওযুর শেষে বলা,

«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». «اللّٰهُمَّ اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين».

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তার কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রাসূল।" অপর দো'আর অর্থ, "হে আল্লাহ, আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"

সালাতের আগে মিসওয়াক করা, অর্থাৎ মুখ সাফ করা ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করা, কারণ একটু পরে এ মুখ দ্বারা কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«طهروا أفواهكم للقرآن».

"কুরআনের জন্যে তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল পবিত্র কর।"[15]

[15] আবু বকর আহমদ আল-বাযযার স্বীয় সংকলন 'আল-মুসনাদ আল-কাবির' গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, এবং বলেছেন, "আলি ইবন আবু তালিব থেকে হাদীসটির এর চেয়ে ভালো সনদ আমরা জানি না।" 'কাশফুল আসতার': ১/২৪২। মুহাদ্দিস হায়সামি স্বীয় সংকলন 'আল-মাজমা': ২/৯৯ গ্রন্থে বলেছেন, "হাদীসটির সকল রাবি গ্রহণযোগ্য (সেকাহ)।" মুহাদ্দিস আলবানি বলেছেন, "হাদীসটির সনদ জাইয়্যেদ।" 'সিলসিলাহ আস-সাহিহাহ', হাদীস নং ১২১৩।

তারপর সুন্দর কাপড় পড়ে সালাতের জন্যে সৌন্দর্য গ্রহণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ ۝٣١﴾ [الاعراف: ٣١]

"হে আদম সন্তানেরা, প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা তোমাদের সৌন্দর্য গ্রহণ কর।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৩১]

সত্যিকার অর্থে বান্দার সুন্দর পোশাক ও সৌন্দর্যের বেশি হকদার আল্লাহ তা'আলা। অধিকন্তু সুন্দর কাপড় ও সুন্দর গন্ধ ব্যক্তিকে অভ্যন্তরীণ প্রসন্নতা দান করে—যা ঘুমানোর বস্ত্র ও ময়লা কাপড় দ্বারা সম্ভবপর নয়। অনুরূপভাবে সালাতের প্রস্তুতি হিসেবে শরীরের জরুরি অংশ ঢাকা, জায়গা পবিত্র করা, দ্রুত মসজিদে যাওয়া, মসজিদে গিয়ে সালাতের অপেক্ষা করা, কাতার সোজা করা, গায়ে-গায়ে মিলে দাঁড়ানো প্রভৃতি খুশু অর্জনের সহায়ক। বিশেষভাবে কাতারের মাঝে ফাঁকা থাকলে শয়তান তাতে ঢুকে মুসল্লির খুশু নষ্ট করে।

২. স্থিরতাসহ সালাত আদায় করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের রুকনে রুকনে এমনভাবে স্থির হতেন যে, তার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ স্বস্ব স্থানে ফিরে আসত।[16] তিনি সালাতে ভুলকারীকে স্থির হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

«لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك».

"তোমাদের কারো সালাত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না সে তা স্থিরতাসহ আদায় করবে।"[17]

আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قال يا رسول الله: كيف يسرق صلاته؟، قال :لا يتم ركوعها ولا سجودها».

"চুরির বিবেচনায় সবচেয়ে খারাপ চোর সে, যে তার সালাত থেকে চুরি করে। আবু কাতাদা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, সালাতে কীভাবে চুরি করে? তিনি বললেন, তার রুকু ও সাজদাহ পূর্ণ করে না।"[18]

---

[16] শাইখ আলবানি সংকলিত 'সিফাতুস সালাত': পৃ.১৩৪; তিনি হাদীসটির সনদ সহীহ বলেছেন। হাফিয ইবন হাজার বলেন, "সহি ইবন খুযাইমাতেও হাদীসটি সহীহ গুণে বিদ্যমান আছে।" 'ফাতহুল বারি': ২/৩০৮।

[17] আবু দাউদ: ১/৫৩৬, হাদীস নং ৮৫৮।

[18] ইমাম আহমদ সংকলিত 'মুসনাদ'। আরো দেখুন, ইমাম হাকিম সংকলিত 'আল-মুসদাতদারক': ১/২২৯, এবং আলবানি সংকলিত 'সহীহ আল-জামি', হাদীস নং ৯৯৭।

আবু আব্দুল্লাহ আশ‘আরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مثل الذي لا يتمّ ركوعه، وينقر في سجوده، مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين، لا يغنيان عنه شيئا».

“যে তার সালাতের রুকু পূর্ণ করে না, আর সাজদায় গিয়ে ঠোকর মারে, তার উদাহরণ ঐ ক্ষুধার্তের ন্যায় যে একটি ও দু’টি খেজুর খায়, যা তার কোনো কাজে আসে না।”[19]

স্বভাবত, যে সালাতের রুকনে রুকনে স্থির হয় না তার সালাতে খুশু অর্জন হয় না, কারণ দ্রুততা সালাতের খুশু নষ্ট করে, আর তার সাওয়াব নষ্ট করে কাকের ঠোকরের মতো সাজদাহ।

৩. সালাতে মৃত্যুকে স্মরণ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحريّ أن يحسن صلاته، وصلّ صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها».

“তুমি তোমার সালাতে মৃত্যুকে স্মরণ কর। কারণ, ব্যক্তি যখন তার সালাতে মৃত্যুকে স্মরণ করে তখন তার সালাত অবশ্যই সুন্দর হয় এবং ঐ ব্যক্তির মতো সালাত পড় যে ধারণা করে সে আর কোনো সালাত পড়ার সুযোগ পাবে না।”[20]

অনুরূপ অর্থ প্রদানকারী আরো হাদীস রয়েছে, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন,

«إذا قمت في صلاتك فصلِّ صلاة مودِّع».

“যখন তুমি সালাতে দাঁড়াও তখন বিদায়ী ব্যক্তির ন্যায় সালাত পড়।”[21]

অর্থাৎ এমন ব্যক্তির ন্যায় সালাত আদায় কর, যে ধারণা করে এটাই তার শেষ সালাত। কারণ, মুসল্লি এক দিন মারা যাবে, মৃত্যু তার জন্যে অবধারিত, তাই অবশ্যই তার শেষ সালাত আছে। অতএব এ সালাতেই শেষ সালাতের ন্যায় খুশু অর্জন করা জ্ঞানীর কাজ। কেননা, হতে পারে এটাই তার শেষ সালাত।

৪. সালাতে পঠনীয় সূরা-কিরাত এবং অন্যান্য দো‘আ ও যিকির গভীর মনোযোগ দিয়ে ভাবা

---

[19] আবুল কাসিম সুলাইমান তাবরানি সংকলিত ‘আল-মুজাম আল-কাবির’: ৪/১১৫। আলবানি ‘সহীহ আল-জামি’ গ্রন্থে হাদীসটি হাসান বলেছেন।

[20] নাসিরুদ্দিন আলবানি সংকলিত ‘আস-সহিহাহ’, হাদীস নং ১৪২১। আলবানি সুয়ুতির বরাতে বলেন, “হাফিয ইবন হাজার হাদীসটি হাসান বলেছেন।”

[21] ইমাম আহমদ সংকলিত ‘মুসনাদু’: ১/৪১২; ‘সহীহ আল-জামি’, হাদীস নং ৭৪২।

ও বুঝার চেষ্টা করা এবং তার সাথে আন্দোলিত হওয়া। কারণ, মানুষের চিন্তা ও গবেষণার জন্যেই কুরআন নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٩﴾ [ص: ٢٩]

"আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যেন তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যেন বুদ্ধিমানেরা উপদেশ গ্রহণ করে।" [সূরা সাদ, আয়াত: ২৯]

বাস্তবতা হচ্ছে, মুসল্লি সালাতের ভেতর যেসব আয়াত, তাসবিহ, সালাত (দরূদ), সালাম ও দো'আ পাঠ করে, সে যদি তার অর্থ না জানে তার পক্ষে তাতে গবেষণা করা সম্ভবপর নয়। অর্থ জানার পরেই তাতে চিন্তা করতে সমর্থ হবে, যার ফলে তার অশ্রু ঝরবে ও দেহ-মন আন্দোলিত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় বান্দাদের প্রশংসা করে বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ لَمۡ يَخِرُّواْ عَلَيۡهَا صُمّٗا وَعُمۡيَانٗا ٧٣﴾ [الفرقان: ٧٣]

"যখন তাদেরকে তাদের রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় তখন তার প্রতি অন্ধ ও বধিরের মতো তারা আচরণ করে না।" [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭৩] এ আয়াত থেকে কুরআনুল কারিমের অর্থ ও তাফসির জানার গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়।

ইবন জারির রহ. বলেন, "যে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করে কিন্তু তার তাফসির জানে না সে কীভাবে তার স্বাদ আস্বাদন করে, আমি খুব বিস্ময় বোধ করি।"[22]

অতএব কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করার সঙ্গে তাফসিরের সংক্ষেপিত কিতাব হলেও পাঠ করা জরুরি, যেমন (আরবি ভাষীদের জন্যে) ১. মুহাম্মদ আশকার কর্তৃক শাওকানির তাফসিরের সংক্ষেপিত কিতাব 'যুবদাতুত তাফসির'। ২. ইবন সা'দির তাফসির 'তাইসিরুল কারিমির রাহমান ফি তাফসিরিল কালামিল মান্নান'। পূর্ণ তাফসির পাঠ করা যদি সম্ভবপর না হয়, অন্ততপক্ষে কুরআনুল কারিমের শব্দার্থের অভিধান পাঠ করা, যেমন ৩. আব্দুল আযিয সিরওয়ান রচিত 'আল-মুজামুল জামি লি গারিবি মুফরাদাতিল কুরআন'। এই অভিধানে কুরআনুল কারিমের শব্দার্থের চারটি অভিধানগ্রন্থ সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে[23]।

---

[22] মাহমুদ শাকের কর্তৃক ইমাম তাবারির 'তাফসির' এর ভূমিকা: ১/১০।

[23] বাংলা ভাষীদের জন্যে সংক্ষিপ্ত তাফসির, যেমন ১. তাফসির 'তাইসীরুল কুরআন' অর্থানুবাদ অধ্যাপক মোহাম্মাদ মুজ্জাম্মেল হক। ২. 'আল-কুরআনুল কারীম' ইসলামিক ফাউন্ডেশন। ৩. 'তফসীর আহসানুল বায়ান, সংকলন: সালাহউদ্দীন ইউসূফ, অনুবাদ: আব্দুল হামীদ ফাইযী। ৪. 'শব্দার্থে আল কুরআনুল মাজীদ' (১০ খণ্ড) অনুবাদক: মতিউর রহমান খান। ৫. 'শব্দে শব্দে আল কুরআন'। লেখক:

সালাতে চিন্তা, খুশু, একাগ্রতা ও গবেষণার আরো একটি সহায়ক একেকটি আয়াত বারবার পড়া। বস্তুত, চিন্তার জন্যে গভীরভাবে অধ্যয়ন ও বারবার পড়ার বিকল্প নেই। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতক আয়াত বারবার পড়তেন। বর্ণিত আছে, তিনি:

﴿إِن تُعَذِّبۡهُمۡ فَإِنَّهُمۡ عِبَادُكَۖ وَإِن تَغۡفِرۡ لَهُمۡ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١١٨﴾ [المائدة: ١١٨]

আয়াতটি পড়তে পড়তে ভোর করেছেন।[24] অর্থ, "যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন তবে তারা আপনারই বান্দা, আর যদি তাদের ক্ষমা করেন, তবে নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ১১৮]

সালাতে খুশু ও একাগ্রতা অর্জনের নিমিত্তে চিন্তা ও গবেষণার আরো একটি সহায়ক তিলাওয়াতের সঙ্গে ভাবভঙ্গিতে আন্দোলিত হওয়া, যেমন হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«صليت مع رسول الله ذات ليلة. يقرأ مسترسلاً، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ».

"আমি কোনো এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সালাত পড়েছি। তিনি একেকটি আয়াত পৃথক পৃথক পড়ছিলেন। যখন (আল্লাহর) প্রশংসাসূচক আয়াত পড়তেন তখন তার প্রশংসা করতেন, যখন প্রার্থনাসূচক আয়াত পড়তেন তখন তার কাছে প্রার্থনা করতেন, আর যখন আশ্রয় চাওয়ার আয়াত পড়তেন তখন তার কাছে আশ্রয় চাইতেন।"[25] অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন,

«صليت مع رسول الله ليلة، فكان إذا مرّ بآية رحمة سأل، وإذا مرّ بآية عذاب تعوذ، وإذا مرّ بآية فيها تنزيه لله سبح».

"আমি কোনো রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সালাত পড়েছি। তার নিয়ম ছিল, যখন রহমতের আয়াত অতিক্রম করতেন প্রার্থনা করতেন, যখন শাস্তির আয়াত অতিক্রম করতেন পানাহ চাইতেন, যখন পবিত্রতা দ্যোতক আয়াত পড়তেন তখন পবিত্রতা

মাওলানা মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান। ৬. 'কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর' ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া। শেষোক্ত গ্রন্থটি বিনা মূল্যে বিতরণের জন্যে সৌদি আরবের সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। অনুবাদক।

[24] সহীহ ইবন খুযাইমাহ: ১/২৭১; ইমাম আহমদ সংকলিত 'মুসনাদ': ৫/১৪৯; আলবানি সংকলিত 'সিফাতুস সালাত': পৃ.১০২।

[25] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৭২।

বর্ণনা করতেন।"[26] উল্লেখ্য ঘটনাটি শেষ রাতের সালাত সংক্রান্ত।

ইবন হাজার বলেন, "কাতাদা ইবন নুমান রাদিয়াল্লাহু আনহু র ঘটনা, তিনি একদা রাতে দাঁড়িয়ে সূরা ইখলাস ছাড়া কিছুই পড়েন নি, বারবার সূরা ইখলাসই পড়েছেন, তার একটুও বেশি পড়েন নি।"[27]

ইমাম কুরতুবি 'আত-তাযকিরাহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, "সা'ঈদ ইবন উবাইদ তায়ি বলেন, আমি রমাদান মাসে একদা সা'ঈদ ইবন জুবায়েরের ইমামতিতে সালাত পড়েছি, তখন নিম্নের আয়াতটি তিনি বারবার পড়েছেন,

﴿فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ ٧٠ إِذِ ٱلۡأَغۡلَٰلُ فِيٓ أَعۡنَٰقِهِمۡ وَٱلسَّلَٰسِلُ يُسۡحَبُونَ ٧١ فِي ٱلۡحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسۡجَرُونَ ٧٢﴾ [غافر: ٧٠، ٧٢]

'অতএব তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। যখন তাদের গলদেশে বেড়ী ও শিকল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে।' [সূরা আল-মুমিন, আয়াত: ৭০]

কাসিম রহ. বলেন, আমি সা'ঈদ ইবন জুবায়েরকে রাতে দাঁড়িয়ে সালাত পড়তে দেখেছি, তখন তিনি বারবার পড়ছিলেন,

﴿وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا تُرۡجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٨١﴾ [البقرة: ٢٨١]

আয়াতটি তিনি বিশেরও বেশিবার পড়েন। অর্থ 'আর তোমরা সে দিনকে ভয় কর, যে দিন তোমাদের আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। তারপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তা পুরোপুরি দেয়া হবে যা সে উপার্জন করেছে। আর তাদের যুলম করা হবে না।' [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮১]

কায়েস বংশীয় আবু আব্দুল্লাহ উপনামী জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'আমরা হাসান বসরির নিকট কোনো এক রাত যাপন করলাম, দেখলাম রাতে তিনি ঘুম থেকে জেগে সালাত পড়তে দাঁড়ালেন, তারপর নিম্নের আয়াতটি ভোর পর্যন্ত বারবার পড়লেন,

﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآۗ ١٨﴾ [النحل: ١٨]

"যদি তোমরা আল্লাহর নি'আমত গণনা কর, তবে সেগুলো নির্ণয় করতে পারবে না।" [সূরা

[26] মুহাম্মাদ ইবন নাসর আল-মারওয়াযি সংকলিত 'তাজিমু কাদরিস সালাত': ১/৩২৭।

[27] সহীহ বুখারির ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফাতহুল বারি': ৯/৫৯; ইমাম আহমদের 'মুসনাদ': ৩/৪৩।

আন-নাহাল, আয়াত: ১৮]

তিনি যখন ভোর করলেন আমরা বললাম, হে আবু সা'ঈদ, পুরো রাতেও আয়াতটি অতিক্রম করা সম্ভব হলো না? তিনি বললেন, 'আমি তার থেকে উপদেশ গ্রহণ করছিলাম। যতবার শুরু ও শেষ করেছি ততবার আমার উপর নি'আমত বর্ষণ হয়েছে। আর আল্লাহর যেসব নি'আমত আমরা জানি না তা তো অনেক।'

হারুন ইবন রাবাব উসাইদি তাহাজ্জুদের সালাতে দাঁড়িয়ে নিম্নের আয়াতটি পড়তে পড়তে কখনো কখনো ভোর করে ফেলতেন,

﴿فَقَالُواْ يَٰلَيۡتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢٧﴾ [الانعام: ٢٧]

"আর ভোর পর্যন্তই কাঁদতেন। অর্থ, 'তখন তারা বলবে, 'হায়! যদি আমাদের ফেরত পাঠানো হত। আর আমরা আমাদের রবের আয়াতসমূহ অস্বীকার না করতাম এবং আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" [সূরা আল-আনআম, আয়াত: ২৭][28] কুরতুবি থেকে উদ্ধৃত অংশ শেষ হলো।

সালাতে খুশু অর্জনের আরো একটি সহায়ক অধিকহারে কুরআনুল কারিম ও বিভিন্ন দো'আ মুখস্থ করা। কেননা, একেক সময় একেক সূরা, যিকির ও দো'আ পাঠ করা চিন্তা ও গভীর মনোযোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। বলাই বাহুল্য যে, সালাতে পঠনীয় আয়াত ও যিকিরে চিন্তা ও গবেষণা করা, একটি আয়াত বারবার পড়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার সাথে আন্দোলিত করা খুশু বৃদ্ধির সেরা উপায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَخِرُّونَ لِلۡأَذۡقَانِ يَبۡكُونَ وَيَزِيدُهُمۡ خُشُوعٗا۩ ١٠٩﴾ [الاسراء: ١٠٩]

"তারা কাঁদতে-কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।" [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১০৯]

একাগ্রতার প্রেরণাদায়ক একটি ঘটনা

ইমাম ইবন হিব্বান বর্ণনা করেন, "তবেয়ি আতা রহ. বলেন, আমি ও 'উবাইদ ইবন ওমায়ের আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—র নিকট গেলাম। 'উবাইদ তাকে বলল, আপনার চোখে দেখা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি আশ্চর্য ঘটনা আমাদের শুনান। তিনি কেঁদে ফেললেন ও বললেন, তিনি কোনো এক রাতে উঠে বলেন: «يا عائشة ذريني أتعبّد لربي». 'হে আয়েশা, আমাকে ছাড়, আমি আমার রবের ইবাদত করব।' আয়েশা বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি আপনার নৈকট্য পছন্দ করি এবং যা আপনার পছন্দের কারণ তাও আমি

[28] ইমাম কুরতুবি সংকলিত 'আত-তাযকিরাহ': পৃ.১২৫।

পছন্দ করি। আয়েশা বলেন, তিনি উঠলেন, ওযু করলেন ও সালাতে দাঁড়ালেন। তারপর কাঁদতে লাগলেন, ফলে তার বুক ভিজে গেল। আরো কাঁদলেন, এতো কাঁদলেন মাটিও ভিজে গেল। ইতোমধ্যে তাঁকে সালাতের সংবাদ দিতে বেলাল এলো। বেলাল যখন দেখল তিনি কাঁদছেন, তখন বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কাঁদছেন, অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন? তিনি বললেন,

«أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت عليّ الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكّر ما فيها»: ﴿إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ... الآية ﴾ [ال عمران: ١٩٠]».

'আমি কি শোকর গোজার বান্দা হব না? আজ রাতে আমার ওপর কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, ধ্বংস তার জন্যে যে তা পড়ল, কিন্তু তাতে চিন্তা করল না। আয়াতগুলো হচ্ছে:

﴿إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ... الآية ﴾ [ال عمران: ١٩٠]

"নিশ্চয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে...।' [সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১৯০]"[29]

ঘটনাটি থেকে যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতে চিন্তা ও খুশুর বিষয়টি স্পষ্ট হয়, তেমন স্পষ্ট হয় তার আবশ্যকতা।

সুরা ফাতিহা শেষে 'আমীন' বলাও আয়াতের সঙ্গে সঙ্গ দেওয়ার একটি অংশ। আর 'আমীন' বলার সাওয়াব তো আছেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذا أمّنَ الإمام فأمّنُوا فإنه مَن وافق تأمِينُهُ تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه».

"যখন ইমাম 'আমীন' বলে, তোমরাও তখন আমীন বল। কারণ, যার 'আমীন' মালায়েকার 'আমীনে'র সাথে মিলবে তার পূর্বের সব পাপ মাফ করা হবে।"[30]

অনুরূপভাবে যখন ইমাম বলে: سمع الله لمن حمده (আল্লাহ ঐ ব্যক্তির কথা শুনেন যে তার প্রশংসা করে) তখন মুক্তাদির ربنا ولك الحمد (হে আমাদের রব, তোমার জন্যেই সকল প্রশংসা) বলে ইমামকে সঙ্গ দেওয়া খুশুর আলামত। আর সাওয়াব তো আছেই।

রিফাআ ইবন রাফি আয-যারকি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে সালাত পড়ছিলাম, যখন তিনি سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে রুকু থেকে মাথা তুললেন, তখন পেছন থেকে কেউ বলল, «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ» (হে

[29] সহীহ ইবন হিব্বান। আলবানি সংকলিত 'আস-সহীহাহ', হাদীস নং ৬৮, তিনি বলেছেন, "এই সনদটি জাইয়্যেদ।"

[30] সহীহ বুখারি, হাদীস নং ৭৪৭।

আমাদের রব, তোমার জন্যেই প্রশংসা, অনেক প্রশংসা, পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা) তিনি সালাত শেষ করে বললেন, «من المتكلم» 'কথক কে?' লোকটি বলল, 'আমি'। তিনি বললেন, «رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول». 'আমি ত্রিশেরও অধিক ফেরেশতা দেখেছি, সবার আগে কে তার সাওয়াব লিখবে প্রতিযোগিতায় তার দিকে ছুটে আসছে।"[31]

৫. একেকটি আয়াত পৃথক পৃথক তিলাওয়াত করা। এভাবে তিলাওয়াত করলে বুঝতে ও চিন্তা করতে সহজ হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই তিলাওয়াত করতেন, যেমন তাঁর তিলাওয়াত সম্পর্কে উম্মে সালামাহ—রাদিয়াল্লাহু আনহা—বলেন, "তিনি بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ বলতেন, (অপর বর্ণনায় এসেছে, তারপর ওয়াকফ করতেন,) তারপর বলতেন, ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢﴾ (অপর বর্ণনায় এসেছে, তারপর ওয়াকফ করতেন,) ﴿ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣﴾ তারপর বলতেন, ﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤﴾ এভাবে তিনি একেকটি আয়াত পৃথক পৃথক তিলাওয়াত করতেন।"[32]

অতএব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করে প্রত্যেক আয়াত শেষে ওয়াকফ করা সুন্নাত, যদিও পঠনীয় আয়াতের অর্থ পূর্বাপর আয়াতের অর্থের সাথে সম্পৃক্ত হয়।

৬. কুরআনুল কারীম তারতিলসহ সুন্দর আওয়াজে তিলাওয়াত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا﴾ [المزمل: ٤]

"তুমি স্পষ্টভাবে ধীরেধীরে কুরআন আবৃত্তি কর।" [সূরা আল-মুযযাম্মিল, আয়াত: ৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করতেন, «مفسرة حرفاً حرفًا» "একটি একটি হরফ সুস্পষ্টভাবে।"[33] ইমাম মুসলিম তার তিলাওয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন,

«وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সূরা পড়তেন তারতিলসহ পড়তেন, এমন কি

---

[31] সহীহ বুখারি বর্ণিত, দেখুন 'ফাতহুল বারি': ২/২৮৪।

[32] আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০০১; আলবানি প্রণীত 'আল-ইরওয়া': ২/৬০, তিনি এর বিভিন্ন সনদ উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন হাদীসটি সহি।

[33] ইমাম আহমদ সংকলিত 'মুসনাদু': ৬/২৯৪; আলবানি হাদীসটির সনদ সহীহ বলেছেন। 'সিফাতুস সালাত': পৃ.১০৫।

সেটি (বিনা তারতিলে পঠিত) তার চেয়ে দীর্ঘ সূরা থেকেও দীর্ঘ হয়ে যেত।”[34]

দ্রুত গতিতে তিলাওয়াত করা অপেক্ষা তারতিলসহ আয়াতে আয়াতে ওয়াকফ করে তিলাওয়াত করা চিন্তা ও খুশুর জন্যে বেশি সহায়ক। খুশুর আরেকটি সহায়ক হচ্ছে সুন্দর স্বরে তিলাওয়াত করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنًا».

“তোমরা তোমাদের আওয়াজ দ্বারা কুরআনুল কারিমকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। কেননা, সুন্দর আওয়াজ কুরআনুল কারীমের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।”[35]

উল্লেখ্য যে, সুন্দর আওয়াজের অর্থ (কারীদের ন্যায়) টেনে-টেনে ও পাপীদের সঙ্গীতের ন্যায় সুর করে পড়া নয়; বরং চিন্তার আওয়াজে সুন্দর করে পড়াই উদ্দেশ্য, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن من أحسن الناس صوتًا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله».

“কুরআনুল কারিমে তার আওয়াজই সবচেয়ে সুন্দর, যাকে তিলাওয়াত করতে শুনলে তোমরা মনে কর আল্লাহকে ভয় করছে।”[36]

৭. সালাতের সময় মনে করা যে, আল্লাহ তা‘আলা আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى عليّ عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجّدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل».

“আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দু’ভাগে ভাগ করেছি। আর আমার বান্দার জন্যে তাই রয়েছে—যা সে চাইবে। যখন বান্দা বলে, ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢﴾ (সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্যে, যিনি গোটা জগতের রব) তখন আল্লাহ বলেন, حمدني عبدي (আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।) যখন বান্দা বলে, ﴿ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

[34] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৩৩।

[35] ইমাম হাকিম সংকলিত ‘আল-মুসতাদরাক’: ১/৫৭৫; ‘সহীহ আল-জামি’, হাদীস নং ৩৫৮১।

[36] ইবন মাজাহ: ১/১৩৩৯; ‘সহীহ আল-জামি’, হাদীস নং ২২০২।

﴿٣﴾ (পরম দয়ালু অতীব মেহেরবান।) তখন আল্লাহ বলেন, أثنى علي عبدي (আমার বান্দা আমার গুণাবলি বর্ণনা করেছে।) যখন বান্দা বলে, ﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤﴾ (প্রতিদান দিবসের মালিক।) তখন আল্লাহ বলেন, مجدني عبدي (আমার বান্দা আমাকে মর্যাদা দিয়েছে।) যখন বান্দা বলে, ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥﴾ (আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং কেবল আপনার কাছেই সাহায্য চাই।) তখন আল্লাহ বলেন, هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، (এটি আমার ও আমার বান্দার জন্যে, আর আমার বান্দার জন্যে তাই রয়েছে—যা সে চাইবে।) যখন বান্দা বলে, ﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧﴾ (আমাদের সরল পথের হিদায়েত দিন, তাদের পথ—যাদের ওপর আপনি নিয়ামত দিয়েছেন এবং যাদের ওপর আপনার ক্রোধ পতিত হয় নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়।) তখন আল্লাহ বলেন, هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. (এটা আমার বান্দার জন্যে, আর আমার বান্দার জন্যে তাই রয়েছে—যা সে চাইবে।)"[37]

প্রকৃত মুসল্লির নিকট হাদীসটির মূল্য অনেক, যদি প্রত্যেক মুসল্লি হাদীসটি মনে-প্রাণে গ্রহণ করে, প্রত্যেকের সালাতেই পূর্ণ খুশু হাসিল হবে এবং প্রত্যেকে তাদের সালাতে ফাতিহা পড়ার স্বাদ অনুভব করবে। কেন করবে না, অথচ মুসল্লি নিজেই রবকে সম্বোধন করছে এবং তার চিন্তায় আছে তিনি তার উত্তর দিচ্ছেন।

অতএব মুসল্লি মাত্রের সূরা ফাতিহার মাধ্যমে মহান রবের সাথে সম্বোধন ও কথোপকথন করার মূল্য দেওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه».

"তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সাথে কথোপকথন করে, অতএব সে তার রবের সাথে কীভাবে কথা বলবে চিন্তা করুক।"[38]

৮. সালাতের শুরুতে সুতরা গ্রহণ করা ও সুতরার নৈকট্যে দাঁড়ানো। কেননা, সুতরা দৃষ্টিকে সংকোচিত করে, শয়তান থেকে সুরক্ষা দেয় ও সামনে দিয়ে মানুষের আসা-যাওয়ার সম্ভাবনা বন্ধ করে, আর এগুলো মুসল্লির সালাতে ব্যাঘাত ঘটায় ও তার সাওয়াব নষ্ট করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها».

---

[37] সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত।

[38] ইমাম হাকিম সংকলিত 'আল-মুসতাদরাক': ১/২৩৬; 'সহীহ আল-জামি', হাদীস নং ১৫৩৮।

“যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে, তখন সে সুতরার দিকে ফিরে সালাত আদায় করবে এবং তার নিকটে দাঁড়াবে।”[39] তিনি অপর হাদিসে বলেছেন,

«إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته».

“তোমাদের কেউ যখন সুতরার দিকে ফিরে সালাত আদায় করবে, সে তার নিকটে দাঁড়াবে, তাহলে শয়তান তার সালাত নষ্ট করবে না।”[40]

ইবন হাজার বলেন, “সুতরার ক্ষেত্রে সুন্নত হচ্ছে মুসল্লির পা ও সুতরার মাঝে তিন হাত ব্যবধান রাখা, আর সাজদার জায়গা ও সুতরার মাঝে একটি বকরি চলাচলের মতো ফাঁকা রাখা, যেমন একাধিক সহীহ হাদিসে এসেছে।”[41]

মুসল্লিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন, সুতরার ভেতর দিয়ে কাউকে যেতে দিবে না, যেমন তিনি বলেছেন,

«إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، و ليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين».

“যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে তখন কাউকে তার সামনে দিয়ে যেতে দিবে না, তাকে যথাসম্ভব বাঁধা দিবে। যদি সে বিরত না হয় তার সঙ্গে লড়াই করবে, কারণ তার সাথে শয়তান রয়েছে।”[42]

ইমাম নববী রহ. বলেন, “সুতরার হিকমত হচ্ছে তার বাহির থেকে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রাখা, তার ভেতর দিয়ে কাউকে যেতে না দেওয়া, শয়তানের চলাচলকে বাধাগ্রস্ত করা এবং মুসল্লির সালাত নষ্ট করতে তার উপস্থিত হওয়ার সুযোগ বন্ধ করা।”[43]

৯. বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত সম্পর্কে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন,

«كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة، وضع يده اليمنى على اليسرى».

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে ডান হাত বাম

---

[39] আবু দাউদ: ৫৯৮; ‘সহীহ আল-জামি’, হাদীস নং ৬৫১।

[40] আবু দাউদ: ১/৪৪৬, হাদীস নং ৬৯৫; ‘সহীহ আল-জামি’, হাদীস নং ৬৫০।

[41] সহীহ বুখারির ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘ফাতহুল বারি’: ১/৫৭৪, ৫৭৯।

[42] সহীহ মুসলিম: ১/২৬০; সহীহ আল-জামি, হাদীস নং ৭৫৫।

[43] ইমাম নববি কর্তৃক সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ: ৪/২১৬।

হাতের উপর রাখতেন।”[44] ইমাম আবু দাউদ তার হাত রাখা সম্পর্কে বলেন, «وكان يضعهما على الصدر». “আর তিনি দু’হাত বুকের উপর রাখতেন।”[45] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة».

“আমরা নবীদের জামাআত, সালাতে আমাদের ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতে নির্দেশ করা হয়েছে।”[46]

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহ. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, “দাঁড়ানো অবস্থায় এক হাতের উপর আরেক হাত রাখার মানে কী? তিনি বললেন, এটা পরাক্রমশালী আল্লাহর সমীপে দাঁড়ানোর ভদ্র ও বিনয়ের অবস্থা।”[47]

ইবন হাজার বলেন, “আলিমগণ বলেছেন, বিনয়ী প্রার্থনাকারীরা বুকে হাতের উপর হাত রেখে দাঁড়ায়। এ জন্যেই সালাতে এভাবে দাঁড়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু এভাবে দাঁড়ালে অহেতুক নড়াচড়া করার সুযোগ থাকে না, ফলে খুশু ও একাগ্রতা অর্জন করতে সহজ হয়।”[48]

১০. সাজদার জায়গায় চোখ রাখা। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতে দাঁড়াতেন মাথা নিচু রাখতেন ও মাটির দিকে দৃষ্টি দিতেন।”[49]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আরো বর্ণিত আছে, «ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج عنها». “যখন তিনি কা‘বাতে প্রবেশ করেছেন তখন সাজদার জায়গা

[44] সহীহ মুসলিম: ৪০১।

[45] আবু দাউদ: ৭৫৯; আলবানি প্রণীত ‘ইরওয়াউল গালিল’: ২/৭১।

[46] ইমাম তাবরানি সংকলিত ‘আল-মুজাম আল-কাবির’, হাদীস নং ১১৪৮৫; হায়সামি বলেছেন, “তাবরানি আওসাত গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তার সকল রাবি সেকাহ।” ‘আল-মাজমা’: ৩/১৫৫।

[47] ইবন রজব প্রণীত ‘আল-খুশু ফিস সালাত’: পৃ.২১।

[48] ইবন হাজার প্রণীত ‘ফাতহুল বারি’: ২/২২৪।

[49] ইমাম হাকিম সংকলিত ‘আল-মুসতাদরাক’: ১/৪৭৯; তিনি বলেন, “হাদীসটি বুখারি ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহি।” আলবানি তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ‘সিফাতুস সালাত’: পৃ.৮৯।

থেকে দৃষ্টি হটান নি, যতক্ষণ না সেখান থেকে বের হয়েছেন।”[50]

তাশাহহুদের বৈঠকে ইশারার আঙ্গুলে নজর রাখা ও তা নাড়তে থাকা, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণিত,

«يشير بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها».

“তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলির পাশের আঙ্গুল দিয়ে কিবলার দিকে ইশারা করতেন এবং তার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন।”[51] অপর বর্ণনায় এসেছে,

«وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته».

“তিনি শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করেছেন, তবে তার চোখ তার ইশারাকে অতিক্রম করে নি।”[52]

সালাতে চোখ বন্ধ রাখার বিধান

কতক মুসল্লির অন্তরে একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খায় যে, সালাতে চোখ বন্ধ করে রাখার বিধান কী, বিশেষভাবে যদি এরূপ করার কারণে একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়?

উত্তর: সালাতে চোখ বন্ধ রাখা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত সুন্নতের বিপরীত, পূর্বের আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয়েছে। অধিকন্তু চোখ বন্ধ রাখলে সাজদার জায়গায় নজর দেওয়া ও আঙ্গুল দেখার সুন্নত ছুটে যায়।

মাসআলাটিতে আরো একটু ব্যাখ্যা আছে, দেখি মীমাংসক আলেমগণ কী বলেছেন, বিশেষভাবে আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল কাইয়্যেম রহ. । তিনি বিষয়টি কীভাবে সুরাহা ও সমাধান করেছেন সেটাই এখানে পেশ করব। তিনি বলেছেন: “সালাতে দু’চোখ বন্ধ রাখা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের বিপরীত। উল্লিখিত একাধিক হাদীস থেকে জেনেছি যে, তিনি তাশাহহুদের সময় ইশারার আঙ্গুলে চোখ রাখতেন এবং তার চোখ তার ইশারাকে অতিক্রম করত না।

---

[50] ইমাম হাকিম সংকলিত ‘আল-মুসতাদরাক’: ১/৪৭৯; তিনি বলেছেন, হাদীসটি বুখারি ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহি। আর ইমাম যাহাবি তাকে সমর্থন করেছেন। আলবানি বলেছেন, “হাকেম ও যাহাবি হাদীসটি সম্পর্কে ঠিক বলেছেন।” আলবানির গবেষণা ‘ইরওয়াউল গালিল’: ২/৭৩।

[51] সহীহ ইবন খুযাইমাহ: ১/৩৫৫, হাদীস নং ৭১৯। ইবন খুযাইমার গবেষক বলেন, খুযাইমার সনদটি সহি, দেখুন: ‘সিফাতুস সালাত’: পৃ.১৩৯।

[52] ইমাম আহমদ সংকলিত ‘মুসনাদ’: ৪/৩; আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৯০।

আরো অনেক দলিল রয়েছে চোখ বন্ধ না রাখার, যেমন কুসুফের সালাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জান্নাত দেখে আঙ্গুরের ছড়া ধরতে হাত বাড়ানো; সালাতে জাহান্নাম দেখা; জাহান্নামে বিড়ালওয়ালী ও হাতুড়িওয়ালাকে দেখা; তার সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী চতুষ্পদী জন্তুকে বাঁধা দেওয়া; ছেলে ও মেয়েকে ঠেকানো এবং দুই মেয়ের মাঝে তার আড়াল হয়ে দাঁড়ানো; সালামদাতাকে ইশারা করে উত্তর দেওয়ার একাধিক হাদীস চোখ বন্ধ না রাখার প্রমাণ, কারণ তিনি সালামদাতাকে চোখে দেখেই ইশারা করতেন; অনুরূপ শয়তানকে তাড়া করা, তাকে পাকড়াও করে গলা চেপে ধরা প্রভৃতি ঘটনা তার চোখের দেখা। এসব ঘটনা ও অন্যান্য দলিল থেকে প্রতীয়মান হয় তিনি সালাতে দু'চোখ খোলা রাখতেন।

সালাত আদায় করাবস্থায় চোখ বন্ধ রাখা 'মাকরূহ' কি—না আলিমগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আহমদ ও অন্যান্য ফকিহ বলেন, 'সালাতে চোখ বন্ধ রাখা ইয়াহূদীদের আমল।'

আরেক দল আলেম বলেন, 'সালাতে চোখ বন্ধ রাখা বৈধ, মাকরূহ নয়।'

সঠিক উত্তর হলো, যদি চোখ খোলা রাখলে একাগ্রতায় ব্যাঘাত না ঘটে তবে খোলা রাখা উত্তম। আর যদি কেবলার দিকের কারুকার্য ও সাজ-সজ্জা কিংবা অন্য কিছু মুসল্লি ও তার খুশুর মাঝে প্রতিবন্ধক হয় এবং তার অন্তরকে ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক করে রাখে, তাহলে চোখ বন্ধ রাখা মাকরূহ নয়। এমতাবস্থায় শরীয়তের নীতি ও উদ্দেশ্যের আলোকে চোখ বন্ধ রাখা মাকরূহ বলার চেয়ে মোস্তাহাব বলা অধিক সঙ্গত। আল্লাহ ভালো জানেন।"[53] ইবনুল কাইয়্যেম থেকে আহরণকৃত অংশ শেষ হলো।

উক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হলো যে, সালাতে চোখ বন্ধ না রাখাই সুন্নত, তবে খুশু বিনষ্টকারী বস্তুর অনিষ্ট থেকে সুরক্ষার জন্যে চোখ বন্ধ করা মাকরূহ নয়।

১১. তাশাহহুদে শাহাদাত অঙ্গুলি নাড়ানো। অনেক মুসল্লি তাশাহহুদের বৈঠকে শাহাদাত আঙ্গুল নাড়ানোর সুন্নতটি ছেড়ে দিয়েছেন, অথচ খুশু তৈরিতে তার বিরাট ভূমিকা রয়েছে, আর অনেক ফযীলত তো আছেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لهي أشد على الشيطان من الحديد».

"অঙ্গুলির হরকত শয়তানের ওপর লোহার (আঘাতের) চেয়ে কঠিন।"[54]

---

[53] ইবনুল কাইয়্যেম প্রণীত 'যাদুল মাআদ': ১/২৯৩। প্রকাশক, 'দারুর রিসালাহ'।

[54] ইমাম আহমদ সংকলিত 'মুসনাদ': ২/১১৯; তিনি হাদীসটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। দেখুন 'সিফাতুস সালাত': পৃ.১৫৯।

আহমদ সাআতি হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন, "তাশাহহুদে শাহাদাত আঙ্গুলের ইশারা শয়তানের উপর লোহার আঘাতের চেয়ে কঠিন। কারণ, ইশারা বান্দাকে আল্লাহর তাওহিদ ও ইখলাস স্মরণ করিয়ে দেয়, যা শয়তানের নিকট সর্বাধিক কষ্টের। আল্লাহর নিকট তার থেকে পানাহ চাই।"[55]

ইশারা করার অনেক ফযীলত বলেই সাহাবীগণ একে অপরকে তার উপদেশ দিতেন, যত্নসহ ইশারা করতেন এবং কারো থেকে ছুটে যাচ্ছে কি না পর্যবেক্ষণ করতেন, অথচ বর্তমান যুগে অনেক মুসল্লি শুধু ঢিলেমি ও অবহেলাবশত সেটা ত্যাগ করে চলেছেন। ইবন আবি শায়বাহ রহ. বর্ণনা করেন,

«كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض. يعني: الإشارة بالأصبع في الدعاء».

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ একে অপরের ভুল ধরতেন। অর্থাৎ দো'আর সময় আঙ্গুলের ইশারা না করাকে ভুল গণ্য করতেন।"[56]

ইশারা করার সুন্নত হচ্ছে, পুরো তাশাহহুদ জুড়ে আঙ্গুল উঠিয়ে কেবলা মুখী করে নাড়তে থাকা।

রুকু ও সাজদায় পঠনীয় কতক দো'আ

১২. সালাতে একেক সময় একেক সূরা, আয়াত, যিকির ও দো'আ পড়া। এ নীতির অনুসরণ মুসল্লিকে বিভিন্ন আয়াত ও যিকিরের নতুন নতুন অর্থ ও স্বাদ এনে দেয়। যেসব মুসল্লি হাতে গোনা কয়েকটি সূরা ও যিকির ছাড়া কিছুই জানে না তারা এ স্বাদ থেকে বঞ্চিত। অধিকন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সূরা ও দো'আ পড়া সুন্নত এবং খুশু অর্জনেও সহায়ক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই সালাত পড়তেন, যেমন (ক). তাকবিরে তাহরিমায় তিনি বলতেন:

«اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِن خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» .

"হে আল্লাহ, তুমি আমার ও আমার পাপসমূহের মাঝে দূরত্ব তৈরি কর যেরূপ দূরত্ব তৈরি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ, আমার পাপসমূহ থেকে আমাকে পবিত্র কর, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ, আমার পাপসমূহ থেকে আমাকে

[55] আহমদ সাআতি প্রণীত 'আল-ফাতহুর রাব্বানি': ৪/১৫।

[56] আলবানি প্রণীত 'সিফাতুস সালাত', পৃ.১৪১; তিনি বলেছেন, "হাদীসটি ইবন আবি শায়বাহ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।" আরো দেখুন মুদ্রিত 'মুসান্নাফ' ইবন আবি শায়বাহ, খণ্ড ১০, হাদীস নং ৯৭৩২, পৃ.৩৮১। দারুস সালাফিয়া ইন্ডিয়া।

পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত কর।”

(খ). উক্ত দো‘আর পরিবর্তে কখনো বলতেন:

«وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

“আমি আমার চেহারাকে একান্তভাবে সেই সত্ত্বা অভিমুখী করেছি, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার সালাত, কুরবানি, বেচে থাকা ও মৃত্যু দোজাহানের রব আল্লাহর জন্যে। তার কোনো শরীক নেই, আর তারই আমি আদিষ্ট হয়েছে এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।”

(গ). আবার কখনো বলতেন:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعالَى جَدُّكَ وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ».

“হে আল্লাহ, আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি, আপনার প্রশংসা দ্বারাই আপনার প্রশংসা করি। আপনার নাম বরকতময়, আপনার মর্যাদা অতি উচ্চ এবং আপনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই।”

তাকবিরে তাহরিমার পর ও সূরা ফাতিহার আগে পঠনীয় আরো দো‘আ ও যিকির রয়েছে, মুসল্লি খুশু অর্জনের জন্যে সুন্নতের অনুসরণ করে কখনো এটা কখনো ওটা পাঠ করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াতের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সূরা পাঠ করতেন, যেমন ফজরের সালাতে তিওয়ালে মুফাস্‌সাল থেকে সূরা ওয়াকিয়া, সূরা তুর ও সূরা কাফ; আবার কিসারে মুফাস্‌সাল থেকে সূরা তাকওয়ির, সূরা যিলযাল, সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়েছেন। কখনো সূরা রুম, সূরা ইয়াসিন, সূরা সাফ্‌ফাত প্রভৃতি পড়তেন। আর জুমআর দিন ফজর সালাতে সূরা সাজদাহ ও সূরা দাহর (ইনসান) পড়তেন।

যোহর সালাত সম্পর্কে আছে, প্রথম দু’রাকাতের প্রত্যেক রাকাতে তিনি ত্রিশ আয়াত পরিমাণ পড়তেন। আবার সূরা তারেক, সূরা বুরুজ, সূরা লাইল প্রভৃতি পড়েছেন বর্ণিত আছে।

আসর সালাত সম্পর্কে আছে, প্রথম দু’রাকাতের প্রত্যেক রাকাতে তিনি পনেরো আয়াত পরিমাণ পড়তেন। আবার যোহর সালাতে যেসব সূরা পড়তেন আসরেও সেগুলো পড়েছেন প্রমাণিত আছে।

মাগরিবের সালাতে তিনি কিসারে মুফাস্‌সাল পড়তেন, যেমন সূরা ত্বিন, তবে সূরা মুহাম্মদ, সূরা তুর, সূরা মুরসালাত প্রভৃতি পড়েছেন প্রমাণিত আছে।

এশার সালাতে তিনি আওসাতে মুফাস্‌সাল পড়তেন, যেমন সূরা শামস ও সূরা ইনশিকাক। মুয়ায ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি সূরা আ‘লা, সূরা কালাম ও সূরা লাইল পড়ার

নির্দেশ দিয়েছেন।

রাতের সালাতে তিনি লম্বা লম্বা সূরা পড়তেন। তাতে দেড় শো, দু'শো আয়াত পড়ারও প্রমাণ আছে। কখনো তার চেয়ে কম পড়েছেন।[57]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুকুর তাসবিহও একাধিক ছিল। যেমন (ক). কখনো سبحان ربي العظيم (আমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।) এবং (খ). কখনো سبحان ربي العظيم وبحمده (আমার মহান রবের পবিত্রতা ও তার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি।) পড়তেন, (গ). আবার কখনো পড়তেন, «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ» (প্রশংসার পাত্র, মহাপবিত্র, মালায়েকা ও রূহের রব।) (ঘ). আবার কখনো পড়তেন,

«اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَدَمِي وَلَحْمِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ».

"হে আল্লাহ, আপনার জন্যে রুকু করেছি, আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করেছি এবং আপনার উপর তাওয়াক্কুল করেছি। আপনিই আমার রব। আমার কান, চোখ, রক্ত, গোস্ত, হাড্ডি ও স্নায়ু ভীত হয়েছে দোজাহানের রব আল্লাহর জন্যে।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু থেকে উঠে سمع الله لمن حمده (আল্লাহ তাকে শুনেছেন যে তার প্রশংসা করেছে।) বলার পর বলতেন, ربنا ولك الحمد (হে আমাদের রব, আর আপনার জন্যেই সকল প্রশংসা।) কখনো বলতেন, ربنا لك الحمد (হে আমাদের রব, আপনার জন্যেই

---

[57] মুফাসসাল সূরাগুলোর পরিচয়: একদল আলেম বলেন: তিওয়ালে মুফাসসাল সূরা হুজুরাত থেকে সূরা ইনশিকাক পর্যন্ত। আওসাতে মুফাসসাল সূরা বুরুজ থেকে সূরা বাইয়্যিনাহ পর্যন্ত এবং কিসারে মুফাসসাল সূরা যিলযাল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত।

আরেক দল আলেম বলেন, তিওয়ালে মুফাসসাল সূরা হুজুরাত থেকে সূরা নাযি'আত পর্যন্ত। আওসাতে মুফাসসাল সূরা আবাসা থেকে সূরা লাইল পর্যন্ত। কিসারে মুফাসসাল সূরা দোহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত।

আরেক দল আলেম বলেন, তিলাওয়ালে মুফাসসাল হচ্ছে সূরা হুজুরাত, সূরা কামার ও সূরা আর-রাহমানের ন্যায় সূরাগুলো। আওসাতে মুফাসসাল হচ্ছে সূরা শামস ও সূরা লাইলের ন্যায় সূরাগুলো। কিসারে মুফাসসাল হচ্ছে সূরা আসর ও সূরা ইখলাসের ন্যায় সূরাগুলো।

আরেক দল আলেম বলেন, তিওয়ালে মুফাসসাল সূরা কাফ থেকে সূরা নাবা পর্যন্ত। আওসাতে মুফাসসাল সূরা নাযিআত থেকে সূরা লাইল পর্যন্ত এবং কিসারে মুফাসসাল সূরা দোহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত। সূত্র শায়খ সালিহ আল-মুনাজ্জিদের ওয়েব সাইট www.islamqa.info প্রশ্ন নং ১৪৩৩০১। শায়খ সালিহ 'আল-মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ' : ৪৮:৩৩ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আর 'মাওসুআত' উদ্ধৃত করেছে ইবন হাজার প্রণীত 'ফাতহুল বারি' : ২:২৪৯ ও সুয়ুতি প্রণীত 'আল-ইতকান' : ১:১৮০ থেকে। অনুবাদক।

সকল প্রশংসা।) কখনো বলতেন, اللَّهُمَّ ربنا (و) لك الحمد (হে আল্লাহ, হে আমাদের রব, আর আপনার জন্যেই সকল প্রশংসা।) আবার কখনো বলতেন, «مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ». (আসমান ও জমিন ভর্তি এবং এগুলো ছাড়া যা চান তা ভর্তি আপনার প্রশংসা।) কখনো তার সাথে আরো যোগ করতেন,

«أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ. اللَّهُمَّ! لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

“হে প্রশংসা ও সম্মানের মালিক। হে আল্লাহ, আপনি যা দেন তা আটকে রাখার কেউ নেই এবং আপনি যা আটকে রাখেন তা দান করার কেউ নেই। আর আপনার পাকড়াও থেকে কোনো সম্মানীকে সম্মান নাজাত দিতে পারবে না।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদায় পড়তেন, سبحان ربي الأعلى (আমি আমার মহা উচ্চ রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।) কখনো পড়তেন, سبحان ربي الأعلى وبحمده (আমি আমার মহা উচ্চ রবের পবিত্রতা এবং তার প্রশংসা করছি।) কখনো পড়তেন, «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ». (আপনি মহা প্রশংসিত, মহা পবিত্র, মালায়েকা ও রূহের—জিবরিলের রব) কখনো পড়তেন, «سُبحانَكَ اللّهمَّ ربَّنا وَبِحمدِكَ، اللّهمَّ اغفِرْ لي». (হে আল্লাহ, হে আমাদের রব, আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন।) আবার কখনো পড়তেন,

«اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ».

“হে আল্লাহ, আমি আপনার জন্যেই সাজদাহ করেছি, আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার নিকটই আত্মসমর্পণ করেছি। আমার চেহারা সে সত্ত্বাকে সাজদাহ করেছে যে তাকে সৃষ্টি করেছে ও আকৃতি দিয়েছে; এবং তার কান ও চোখ বিদীর্ণ করেছে। আল্লাহ বরকতময় ও সর্বোত্তম স্রষ্টা।”

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সাজদাহ’র মাঝে স্থিরভাবে বসে পড়তেন «رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي». (হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন। হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন।) কখনো এর সাথে যোগ করতেন, «اللَّهُمَّ اغفرلي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني».

(হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, রহম করুন, আমার ক্ষতিপূরণ করুন, আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, আমাকে হিদায়েত দিন, আমাকে নিরাপদ রাখুন ও আমাকে রিজিক দান করুন।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহহুদের বৈঠকে একাধিক তাশাহহুদ পড়েছেন প্রমাণিত আছে, (ক). যেমন ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তাশাহহুদ,

«التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ

الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». متفق عليه.

"মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সকল ইবাদত আল্লাহর জন্যে। হে নবী, আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত। আর সালাম আমাদের ওপর ও আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রাসূল।"

(খ). ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে ইমাম মুসলিম ও আবু আওয়ানাহ প্রমুখ বর্ণিত তাশাহহুদ, যেমন:

«التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله».

"পবিত্র, বরকতময় মৌখিক ও শারীরিক ইবাদতসমূহ আল্লাহর জন্যে। হে নবী, আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত। আর সালাম আমাদের উপর ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।"

(গ). আবু মুসা আশ'আরি রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে ইমাম মুসলিম ও আবু আওয়ানাহ প্রমুখ বর্ণিত তাশাহহুদ, যেমন:

«التحيات الطيبات والصلوات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباده الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله».

"মৌখিক ও শারীরিক পবিত্র ইবাদতসমূহ আল্লাহর জন্যে। হে নবী, আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত। আর সালাম আমাদের উপর ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রাসূল।"

মুসল্লি যদি কখনো এই তাশাহহুদ কখনো ঐ তাশাহহুদ পড়ে তাহলে সহজে একাগ্রচিত্ত হাসিল হবে। অনুরূপভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পঠনীয় সালাত ও সালাম বিভিন্ন বাক্যের রয়েছে, যেমন,

১- «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

"হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ ও তার পরিবারের উপর রহমত নাযিল করুন। যেমন রহমত নাযিল করেছেন ইবরাহিমের উপর ও তার পরিবারের উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে

আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদের উপর ও তার পরিবারের উপর বরকত দিন, যেমন বরকত দান করেছেন ইবরাহিম ও তার পরিবারের উপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।”

2- «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

“হে আল্লাহ, মুহাম্মাদের উপর, তার বাড়ির সদস্য এবং তার স্ত্রী ও সন্তানদের উপর রহমত নাযিল করুন, যেমন রহমত নাযিল করেছেন ইবরাহিমের উপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। আর আপনি বরকত দিন মুহাম্মাদের উপর, তার বাড়ির সদস্য এবং তার স্ত্রী ও সন্তানদের উপর, যেমন বরকত দান করেছেন ইবরাহিম ও তার পরিবারের ওপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।”

3- «اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ».

“হে আল্লাহ, উম্মী নবী মুহাম্মাদের ওপর ও তার পরিবারের ওপর রহমত নাযিল করুন, যেমন ইবরাহিমের উপর রহমত নাযিল করেছেন। আর আপনি বরকত দিন উম্মী নবী মুহাম্মাদের উপর ও তার পরিবারের উপর, যেমন বরকত দান করেছেন উভয় জগতে ইবরাহীমের ওপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।”

আরো অনেক সালাত ও সালাম রয়েছে। কখনো এটা কখনো ওটা পড়াই সুন্নত, যেমন একটু আগে আলোচিত হয়েছে, তবে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে কিংবা হাদিসের কিতাবসমূহে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন সালাত পাঠ করার পদ্ধতি জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তখন তিনি যেটা যত্নসহ শিখিয়েছেন সেটাকে বিশেষ বিবেচনায় রাখার কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে কোনো একটি সালাত ও সালামকে প্রাধান্য দেওয়া নিন্দনীয় নয়।

জ্ঞাতব্য যে, উল্লিখিত আযকার, তাশাহহুদ, সালাত (দরূদ) ও সালাম আলবানি রাহিমাহুল্লাহ রচিত ‘সিফাতু সালাতিন নবী’ গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছি। এগুলো তিনি সেখানে খুব পরিশ্রম করে হাদিসের বিভিন্ন কিতাব থেকে জমা করেছেন।

১৩. সালাতে তিলাওয়াতের সাজদাহ পাঠ করে সাজদাহ করা। আল্লাহ তা‘আলা নবীদের গুণাবলি বর্ণনায় বলেন,

﴿إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُ ٱلرَّحۡمَٰنِ خَرُّواْۤ سُجَّدٗا وَبُكِيّٗا۩﴾ [مريم: ٥٨]

“যখন তাদের নিকট আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা ক্রন্দনরত অবস্থায়

সাজদাতে লুটিয়ে পড়ে।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৮]

ইবন কাসীর রহ. বলেন, “সকল আলিম বলেছেন, উক্ত আয়াত পাঠ করে সাজদাহ করা নবীদের সুন্নত।”[58]

দ্বিতীয়ত, সালাতে সাজদার আয়াত পাঠ করে সাজদাহ করলে একাগ্রতা তৈরি হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَيَخِرُّونَ لِلۡأَذۡقَانِ يَبۡكُونَ وَيَزِيدُهُمۡ خُشُوعٗا۩ ١٠٩﴾ [الاسراء: ١٠٩]

“তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১০৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত, তিনি সূরা আন-নাজমের সাজদার আয়াত পাঠ করে সাজদাহ করেছেন। আবু রাফে বলেন, “আমি একদা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু র সাথে এশার সালাত আদায় করেছি। লক্ষ্য করলাম তিনি সূরা ইনশিকাক তিলাওয়াত করে সাজদাহ করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সাজদাহ করলেন কেন? তিনি বললেন, আমি এই আয়াত শেষে আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে সাজদাহ করেছি, সুতরাং তার সাথে সাক্ষাত করার পূর্ব পর্যন্ত সাজদাহ করে যাব।”[59]

সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সাজদাহ করা একাগ্রতা অর্জনের জন্যে সহায়ক, অধিকন্তু তিলাওয়াতের সাজদার কারণে শয়তান তুচ্ছ ও লাঞ্ছিত সাব্যস্ত হয়, ফলে মুসল্লিকে কেন্দ্র করে তার ষড়যন্ত্রগুলো নষ্ট হয়ে যায়, যেমন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إذا قرأ ابن آدم السجدة، اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، أمر بالسجود فسجد، فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت، فلي النار».

“বনু আদম যখন সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করে তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান করে, আর বলে, ওহে ধ্বংস! সাজদার নির্দেশ পেয়ে সে সাজদাহ করছে, ফলে তার জন্যে জান্নাত। আর আমাকে সাজদাহ’র আদেশ করা হয়েছিল আমি তার অমান্য করেছি, ফলে আমার জন্যে জাহান্নাম।”[60]

১৪. আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা। শয়তান আমাদের শত্রু, তার শত্রুতার

---

[58] ইবন কাসীর প্রণীত ‘তাফসির’: ৫/২৩৮। ‘দারুশ শা‘ব’ প্রকাশিত।

[59] সহীহ বুখারি, কিতাবুল আযান, বাবুল জাহরি বিল এশা।

[60] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৩।

একটি অংশ হচ্ছে মুসল্লিকে কুমন্ত্রণা দেওয়া, যেন তার খুশু চলে যায় ও তার সালাত সন্দেহ যুক্ত হয়। বস্তুত, যে কেউ যিকির বা ইবাদতে মগ্ন হয় তার ভেতর সংশয় আসবেই, তবে তার কাজ হচ্ছে একাগ্রতায় স্থির থাকা ও ধৈর্য ধরা এবং ইবাদতে অটল থাকা, অস্থির হয়ে ছেড়ে না দেওয়া। কারণ স্থির থাকলে শয়তানের ষড়যন্ত্র ধীরেধীরে দুর্বল ও দূরীভূত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ كَيۡدَ ٱلشَّيۡطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦﴾ [النساء: ٧٦]

"নিশ্চয় শয়তানের ষড়যন্ত্র দুর্বল।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭৬]

বান্দা যখন অন্তর দিয়ে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে তখন বিভিন্ন ওয়াসওয়াসা এসে তাকে হানা দেয়। কারণ, শয়তান ডাকাতের ন্যায়, বান্দা যখন আল্লাহর রাস্তায় চলার ইচ্ছা করে তখন সে তার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায়।

কতক সালাফকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: "ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানেরা বলে আমাদের ওয়াসওয়াসা আসে না। তিনি বললেন: সত্য বলেছে, কারণ শয়তান নষ্ট ঘর দিয়ে কী করবে?"[61]

ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "ঈমান যার ভেতর আছে শয়তান তাকেই ওয়াসওয়াসা দেয়। তার একটি উদাহরণ, তিনটি ঘর রয়েছে, একটি বাদশাহর ঘর, যেখানে তার অর্থ, মূল্যবান জিনিস-পত্র ও মণিমুক্তা রয়েছে। আরেকটি তার প্রজার ঘর, যেখানে প্রজার অর্থ, মূল্যবান জিনিস-পত্র ও মণিমুক্তা রয়েছে, তবে বাদশাহর ঘরের ন্যায় মণিমুক্তা ও মূল্যবান জিনিস-পত্র তাতে নেই। আরেকটি ঘর খালি, যেখানে কিছুই নেই। ইত্যবসরে চোর এসেছে চুরি করতে, সে কোন্ ঘরে চুরি করবে?"[62]

ইবনুল কাইয়্যেম রহ. অন্যত্র বলেন, "বান্দা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন শয়তান হিংসার আগুনে ছটফট করে। কারণ, সে আল্লাহর নৈকট্যপূর্ণ ইবাদত ও তার মহান দরবারে দাঁড়িয়েছে, যা শয়তানের গোস্বার উত্তেজক ও তার জন্যে কঠিন পীড়াদায়ক। তাই সে বান্দার ইবাদত নষ্ট করতে প্রাণপণ চেষ্টা ও সবটুকু সাধ্য ব্যয় করে, তাকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও প্রলোভন দেয় এবং অন্যমনস্ক করার মেহনত করে। তার উপর নিজের অশ্ব ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যেন সে সালাতে অবহেলা করে এবং এক পর্যায়ে তা ছেড়ে দেয়। যদি শয়তান এতে পরাস্ত হয় এবং বান্দা তাকে অবজ্ঞা করে ইবাদতে মগ্ন থাকে, তাহলে আল্লাহর দুশমন ধীরে-ধীরে অগ্রসর হয় এবং বান্দা ও তার নফসে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে। তারপর বান্দা ও তার অন্তরের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় এমন কিছু, যা সালাতে প্রবেশ

---

[61] ইমাম ইবন তাইমিয়ার ফাতওয়া সংকলন 'মাজমুউল ফাতাওয়া': ২২/৬০৮।

[62] ইবনুল কাইয়্যেম প্রণীত 'আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব': পৃ.৪৩।

করার পূর্বে তার স্মৃতিতেই ছিল না। কখনো এমন হয়, মুসল্লি যে জিনিস বা প্রয়োজন ভুলে একেবারে নিরাশ হয়ে গিয়েছে তাও তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যেন তার অন্তর সেটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং তাকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে আনতে সমর্থ হয়। শয়তানের এরূপ নিরন্তর চেষ্টার কারণে মুসল্লি নিজের অজান্তেই এক সময় বিনা খুশুতে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, ফলে সে তার সুদৃষ্টি, সম্মান ও নৈকট্য থেকে বঞ্চিত হয়, যা লাভ করে উপস্থিত অন্তর নিয়ে সালাত আদায়কারী। ফলশ্রুতিতে মুসল্লি পাপ ও গুনাহের যে বোঝা নিয়ে সালাতে দাঁড়িয়েছিল তা নিয়েই সালাত শেষ করে, তার পাপের বোঝা আর হালকা হয় না। কারণ, সালাত দ্বারা তার পাপের বোঝাই হালকা হয় যে নিজের মন ও শরীরসহ সালাতে দাঁড়ায় এবং পূর্ণ একাগ্রতা ও হকসহ তা আদায় করে।"[63]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নের হাদিসে শয়তানের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ ও তার ওয়াসওয়াসা দূর করার জন্যে একটি পদ্ধতি বলেছেন, সাহাবী আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, শয়তান আমার ও আমার সালাতের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং আমার তিলাওয়াতে সন্দেহ সৃষ্টি করে। তিনি বললেন,

«ذاك شيطان يُقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوّذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني».

"সে এক প্রকার শয়তান, তাকে খানযাব বলা হয়। যখন তুমি তাকে অনুভব কর আল্লাহর কাছে তার থেকে আশ্রয় চাও এবং তোমার বাম পাশে তিনবার থুতু নিক্ষেপ কর। আবুল-আস বলেন, আমি তাই করেছি, ফলে আল্লাহ তাকে আমার থেকে দূর করে দিয়েছেন।"[64]

মুসল্লিকে কেন্দ্র করে শয়তানের আরেকটি ষড়যন্ত্র ও তার প্রতিকার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه- يعني خلط عليه صلاته وشككه فيها -حتى لا يدري كم صلى. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس».

"তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন শয়তান এসে তার ভেতর সন্দেহ সৃষ্টি করে (অর্থাৎ বিভিন্ন কল্পনায় লিপ্ত করে তাকে সন্দিহান করে), ফলে সে কত রাকাত পড়েছে বলতে পারে না। তোমাদের কেউ যখন এরূপ অনুভব করে তখন বসাবস্থায় দু'টি সাজদাহ করবে।"[65]

---

[63] ইবনিল কাইয়েম প্রণীত 'আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব':: পৃ.৩৬।

[64] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২০৩।

[65] সহীহ বুখারি, ফরয ও নফল সালাতে সাহু করার পরিচ্ছেদ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের আরেকটি ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বলেন:

«إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث، فأشكل عليه، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا».

“তোমাদের কেউ যখন সালাতে থাকে, তারপর গুহ্যদ্বারে হরকত অনুভব করে সন্দিহান হয় ওযু আছে না টুটে গেছে, সে যতক্ষণ না শব্দ শুনবে কিংবা গন্ধ শুঁকবে ততক্ষণ সালাত ছাড়বে না।”[66]

শয়তানের ষড়যন্ত্র আরো অদ্ভুত। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, যে সালাতে থাকলে সন্দেহ হয় বায়ু ত্যাগ করেছে, যদিও সে বায়ু ত্যাগ করে নি। তিনি বললেন:

«إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته حتى يفتح مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يُحدث، فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينصرفن حتى يسمع صوت ذلك بأذنه أو يجد ريح ذلك بأنفه».

“তোমাদের কেউ যখন সালাতে থাকে তখন তার কাছে শয়তান এসে তার পায়ুপথ উন্মুক্ত করে তাকে সন্দিহান করে যে, সে বায়ু ত্যাগ করেছে যদিও সে বায়ু ত্যাগ করে নি। তোমাদের কেউ যখন এটা অনুভব করবে যতক্ষণ না সে ঐ শব্দ কানে শুনবে কিংবা ঐ গন্ধ নাকে শুঁকবে সালাত ছাড়বে না।”[67]

সালাতে অন্য ইবাদত নিয়ে চিন্তা করার হুকুম

খানযাব নামক শয়তান কতক ভালো মুসল্লির নিকট একটা প্রতারণা নিয়ে হাজির হয়। আর সেটা হচ্ছে, সালাত থেকে তার মনোযোগ হটানোর জন্যে আরেকটি ইবাদতে তাকে মগ্ন করে, যেমন দাওয়াতি কাজের পরিকল্পনা কিংবা ইলমি গবেষণা, ফলে সে সালাতের রাকাত সংখ্যা ভুলে যায়। এ ক্ষেত্রে কখনো কাউকে ধোঁকা দেয় যে, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সালাতে যুদ্ধের পরিকল্পনা করতেন। তাই অনেকে ধোঁকায় পড়ে সালাতের ভেতর আরেকটি ইবাদত নিয়ে ভাবতে ভাবতে বিনা একাগ্রতায় সালাত শেষ করে, তাই তার ঘটনাটি বিশ্লেষণধর্মী।

অতএব আমরা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু র ঘটনার স্বরূপ ও হুকুম জানার জন্যে শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ রহ.-এর শরণাপন্ন হব এবং তিনি যে সমাধান দিয়েছেন সেটাই এখানে পেশ করব। তিনি বলেন, “ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়, তিনি বলেছেন, ‘আমি সালাতে জিহাদের পরিকল্পনা করি।’ তিনি এরূপ করতে পারেন, কেননা তার উপর জিহাদের

---

[66] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৮৯।

[67] ইমাম তাবরানি সংকলিত ‘মুজামুল কাবির’: খ.১১, পৃ.২২২, হাদীস নং ১১৫৫৬। হায়সামি ‘আল-মাজমা’: ১/২৪২ গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসটি যারা বর্ণনা করেছেন তাদের সবার থেকেই সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে।

দায়িত্ব ছিল। তিনি আমিরুল মুমিনিন অর্থাৎ মুমিনদের নেতা হওয়ার সুবাদে জিহাদেরও নেতা ছিলেন। তার অবস্থা ছিল অনেকটা ঐ মুসল্লির মতো, যে শত্রু বাহিনী চোখে দেখে সালাত আদায় করে। তিনি যুদ্ধের ময়দানে থাকতেন বা না থাকতেন তার উপর যুদ্ধের দায়িত্ব ছিল, যেমন ছিল তার উপর সালাতের দায়িত্ব। সমানভাবে দু'টি কর্মই তার দায়িত্বে ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةٗ فَٱثۡبُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٤٥﴾ [الانفال: ٤٥]

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোনো বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন দৃঢ়পদ থাক এবং উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জনের জন্যে আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো।' [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪৫]

কম-বেশী সবাই জানি যে, যুদ্ধরত ও যুদ্ধহীন অন্তরের একাগ্রতা বরাবর নয়। যদি ধরা হয় জিহাদের পরিকল্পনার জন্যে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু র সালাতে ত্রুটি হয়েছে, তবুও ঘটনাটি তার পূর্ণাঙ্গ ঈমান ও ইবাদতে চির ধরাতে পারে না। কারণ নিরাপদ অবস্থার সালাতের চেয়ে ভয়ের অবস্থার সালাতে শিথিলতা একটু বেশি রয়েছে, যেমন সালাতুল খাওফ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَإِذَا ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣﴾ [النساء: ١٠٣]

'তারপর যখন নিশ্চিন্ত হবে তখন সালাত (পূর্বের নিয়মে) কায়েম করবে। নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয।' [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩]

অতএব নিরাপদ অবস্থায় যেভাবে সালাত আদায় করার নির্দেশ রয়েছে ভয়ের অবস্থায় সে নির্দেশ কিছুটা শিথিল বলাই বাহুল্য। এতদসত্ত্বেও সব মানুষের একাগ্রতা সমান নয়। মুসল্লির ঈমান শক্তিশালী হলে তার মনোযোগ শক্তিশালী হয়, যদিও তাতে আরেকটি ইবাদত নিয়ে চিন্তা করে। আর ওমর তো ওমর, আল্লাহ তার জবান ও অন্তরে সত্যকে গেঁথে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন ইলহামসম্পন্ন বিশেষ ব্যক্তি। তার মত মানুষের সালাতে জিহাদের পরিকল্পনা করেও অন্যদের থেকে অধিক মনোযোগী হওয়া অসম্ভব নয়, তবে তার নিজের ক্ষেত্রে জিহাদের চিন্তাসহ সালাতের চেয়ে জিহাদের চিন্তাহীন সালাত উত্তম বলার অপেক্ষা রাখে না।

এতেও সন্দেহ নেই যে, বাহ্যিক ক্রিয়া-কর্মের বিচারে স্বয়ং আল্লাহর রাসূলের নিরাপদ অবস্থার সালাতের চেয়ে ভয়ের অবস্থার সালাত শিথিল ছিল। আল্লাহ ভয়ের অবস্থার সালাতে বাহ্যিক ওয়াজিব শিথিল করেছেন, অতএব অভ্যন্তরীণ ওয়াজিব (খুশু)ও শিথিল করবেন স্বাভাবিক বিষয়।

মোদ্দাকথা, সময় স্বল্পতার কারণে সালাতে জরুরি বিষয় নিয়ে চিন্তা করা, আর জরুরি নয় এমন

বিষয় নিয়ে চিন্তা করা কিংবা জরুরি বিষয় তবে তার চিন্তার জন্যে পর্যাপ্ত সময় আছে, তবুও সালাতে সেটা নিয়ে চিন্তা করা এক কথা নয়। হতে পারে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সালাত ছাড়া অন্য সময় জিহাদ নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ পান নি। কারণ, তিনি ইমামদের ইমাম ছিলেন, তার ছিল অনেক কর্ম-ব্যস্ততা। দায়িত্ব বেড়ে গেলে সবারই কম-বেশী এরূপ হয়।

সালাতে যেসব বিষয়-বস্তু স্মরণ হয় সাধারণত তার বাইরে সেগুলো স্মরণ হয় না। কিছু হয় শয়তানের কাছ থেকে, যেমন জনৈক সালাফের ঘটনা রয়েছে, কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল আমি মাটিতে কিছু সম্পদ পুঁতে রেখেছি কিন্তু তার নির্দিষ্ট জায়গা ভুলে গেছি। তিনি বললেন, যাও গিয়ে সালাতে দাঁড়াও। সে গিয়ে সালাতে দাঁড়াল আর অমনি ঐ বস্তুও তার স্মরণ হলো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, এটা আপনি কীভাবে জানলেন? তিনি বললেন, আমার মনে হয়েছে সালাতে দাঁড়ালে শয়তান তাকে নিস্তার দিবে না। অবশ্যই এমন কিছু স্মরণ করিয়ে দিবে, যা তাকে সালাত থেকে অন্যমনস্ক করবে। এই মুহূর্তে তার নিকট হারানো বস্তুর জায়গা জানার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই, তাই শয়তান তাকে সেটাও স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। প্রকৃত অর্থে সালাতে যে অন্য কাজের সাথে পূর্ণ একাগ্রতার প্রতি সচেষ্ট থাকে সেই বুদ্ধিমান, তবে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া নেকি করার তাওফিক বা পাপ থেকে বিরত থাকার কোনো শক্তি নেই।”[68] ইবন তাইমিয়া থেকে সংগৃহীত অংশ শেষ হলো।

মনীষী ও সালাফদের সালাত

১৫. সালাফদের সালাত কেমন ছিল চিন্তা করা। এতেও খুশু ও একাগ্রতা সৃষ্টি হয় এবং তাদের অনুসরণ করার প্রেরণা তৈরি হয়। ইবন রজব হাম্বলি রহ. বলেন, “আপনি যদি সালাফদের কাউকে সালাতে দাঁড়াচ্ছে দেখেন, লক্ষ্য করবেন যখন সে মুসল্লায় দাঁড়ায় এবং তার রবের কালাম শুরু করে, তখন তার অন্তরে অনুভূত হয় ঠিক যেন এটাই সেই ময়দান, যেখানে কিয়ামতের দিন মানুষেরা সারা জাহানের রবের সামনে দাঁড়াবে, ফলে ভয়ে তার অন্তর উড়ে যায় আর বিবেক হয় স্তম্ভিত-গম্ভীর।”[69]

মুজাহিদ রহ. বলেন, “যখন সালাফদের কেউ সালাতে দাঁড়াতেন তখন তারা কোনো বস্তু দেখতে, এদিক সেদিক চেহারা ঘুরাতে, পাথর নাড়তে, কোনো বস্তু নিয়ে খেলতে, কিংবা দুনিয়াবি জিনিস নিয়ে চিন্তা করতে আল্লাহকে খুব ভয় করতেন, তবে ভুলে ঘটলে ভিন্ন কথা।”[70]

আব্দুল আযিয সালমান উদ্ধৃত করেন, “ইবন যুবায়ের যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন একাগ্রতা

---

[68] ইবন তাইমিয়ার ফাতওয়া সংকলন ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’: ২২/৬১০।

[69] ইবন রজব প্রণীত ‘আল-খুশু ফিস সালাত’: পৃ.২২।

[70] মুহাম্মাদ ইবন নাসর আল-মারওয়াযি সংকলিত ‘তাযিমু কাদরিস সালাত’: ১/১৮৮।

হেতু লাকড়ি বনে যেতেন। একদা তিনি সাজদায় ছিলেন আর কামানের গোলা লেগে তার কাপড়ের অংশ বিশেষ ছিঁড়ে গেল, তবু তিনি মাথা তুলেন নি।

মাসলামা ইবন বাশশার মসজিদে সালাত পড়ছিলেন, ইত্যবসরে মসজিদের অংশ বিশেষ ভেঙ্গে নিচে পড়লে মানুষেরা ছুটোছুটি করে উঠে গেল, কিন্তু তিনি সালাতে ছিলেন তাই টেরও পান নি।

আমাদের কাছে আরো সংবাদ পৌঁছেছে যে, কতক সালাফ হেঙ্গারে ঝুলানো কাপড়ের ন্যায় সালাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কেউ আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর কারণে ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে সালাত শেষ করতেন। কেউ সালাতে দাঁড়ালে ডান-বামের কাউকে চিনতেন না। কারো ওযুর শুরু থেকেই চেহারা হলুদ বর্ণ হয়ে যেত, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি যখন ওযু করেন তখন থেকে আপনার চেহারা পাল্টে যায় কেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি জানি, একটু পরে কার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি!

আলি ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে আছে, সালাতের সময় হলে তিনি কেঁপে উঠতেন, আর তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত। কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনার কী হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, আমানতের সময় হয়েছে, যে আমানত আল্লাহ আসমান ও জমিনকে পেশ করেছিলেন, তারা অপারগতা প্রকাশ করেছে ও ভয় পেয়েছে, আর আমি সেটা গ্রহণ করেছি!

সাইদ তানুখি রহ. সম্পর্কে আছে, তিনি সালাতে দাঁড়ালে চোখের পানি গণ্ডদেশ গড়িয়ে দাড়িতে পড়া শুরু হত।

আমাদের কাছে জনৈক তাবেঈ সম্পর্কে পৌঁছেছে যে, তিনি সালাতে দাঁড়ালে তার রং পাল্টে যেত এবং তিনি বলতেন, তোমরা জান, আমি কার সামনে দাঁড়াব, কার সাথে কথা বলব? প্রিয়-পাঠক, আমাদের ভেতর কে আছে, যার অন্তরে এমন ভীতির সৃষ্টি হয়?”[71] আব্দুল আযিয সালমান থেকে সংগৃহীত অংশ শেষ হলো।

ইবন তাইমিয়াহ উদ্ধৃত করেন, “কিছু লোক আমের ইবন আব্দুল কায়েসকে জিজ্ঞেস করল, আপনার নফস কি সালাতে কল্পনা করে? তিনি উত্তর দিলেন, সালাতের চেয়ে প্রিয় আমার কাছে কী আছে—যা নিয়ে আমি কল্পনা করব! তারা বলল, আমরা তো কল্পনা করি। তিনি বললেন কীসের কল্পনা কর: জান্নাতের কল্পনা, জান্নাতের হুরের কল্পনা বা এ জাতীয় কোনো কল্পনা কর? তারা বলল, না, আমরা আমাদের সম্পদ ও পরিবার নিয়ে কল্পনা করি। তিনি বললেন, আমার শরীর বর্শার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার চেয়ে বেশি কষ্টকর বিষয় হলো সালাতে দুনিয়াবি বিষয় নিয়ে কল্পনা করা।

---

[71] আব্দুল আযিয মুহাম্মাদ প্রণীত ‘সিলাহুল ইয়াকযান লি তারদিশ শায়তান’: পৃ.২০৯।

সা‘দ ইবন মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমার ভেতর তিনটি স্বভাব আছে, যদি আমি তাতে সব সময় থাকতাম তবে আমিই আমি হতাম। যখন আমি সালাতে দাঁড়াই তখন আমার অন্তর সালাত ছাড়া কোনো কল্পনা করে না। আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যখন কোনো হাদীস শুনি তখন তার ব্যাপারে আমার অন্তর কোনো সন্দেহ করে না। আর যখন আমি জানাযার সালাতে থাকি তখন আমার অন্তর মৃত ব্যক্তি কি বলছে ও তাকে কি বলা হচ্ছে ছাড়া কিছুই কল্পনা করে না।”[72]

ইবন রজব উদ্ধৃত করেন, “হাতিম রহ. বলেন, মুয়াজ্জিনের আহ্বান শুনে সালাতের জন্যে রওয়ানা করি, ভয়ে ভয়ে পথ চলি, নিয়ত করে সালাতে প্রবেশ করি, আল্লাহর বড়ত্ব নিয়ে তাকবির বলি, তারতিল ও মনোযোগসহ তিলাওয়াত করি, একাগ্রতাসহ রুকু করি, বিনয়সহ সাজদাহ করি, তাশাহহুদের জন্যে পূর্ণরূপে বসি, পুনরায় নিয়ত করে সালাম ফিরাই, ইখলাসের সাথে সমাপ্ত করি, ভয় নিয়ে নিজেকে যাচাই করি এবং শঙ্কায় থাকি যদি আল্লাহ কবুল না করেন। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরণ মনের ভাবটি সংরক্ষণ করতে চেষ্টা করব।”[73]

আবু বকর সাবগি রহ. বলেন, “আমি দু’জন বড় ইমাম পেয়েছি, তবে তাদের কারো থেকেই হাদীস শ্রবণ করতে পারি নি। আবু হাতিম রাযী ও মুহাম্মাদ ইবন নসর মারওয়াযি। আমার অভিজ্ঞতায় আমি ইবন নাসর থেকে উত্তম সালাত আদায়কারী কাউকে দেখি নি। আমি শুনেছি, তার কপালে ভীমরুল বসেছিল, ভিমরুলের দংশনে তার চেহারায় রক্ত গড়িয়ে পড়েছে তবু তিনি নড়াচড়া করেন নি। মুহাম্মাদ ইবন ইয়াকুব আখরাম বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবন নাসিরের সালাতের চেয়ে সুন্দর সালাত কারো দেখি নি। তিনি সালাতে থাকলে কানের মশাও তাড়াতেন না। আমরা তার সালাতের সৌন্দর্য, একাগ্রতা ও ভয় দেখে আশ্চর্য হতাম। তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে শুকনো লাকড়ির মত নিজের চিবুক বুকের উপর রেখে দিতেন।”[74]

মার‘ঈ আল-কারমি বলেন, “ইবন তাইমিয়া রহ. সালাতে দাঁড়ালে তার অঙ্গগুলো কেঁপে উঠত, তিনি ডানে-বামে ঝুঁকে যেতেন।”[75]

প্রিয় পাঠক, এবার আপনি সালাফদের সালাতের সাথে বর্তমান যুগে আমাদের কিছু লোকের সালাতকে তুলনা করুন। দেখবেন, সালাতে দাঁড়িয়ে কেউ ঘড়ি দেখছে, কেউ কাপড় ঠিক করছে, কেউ নাক দিয়ে অহেতুক শব্দ করছে, কেউ বেচাকেনা শুরু করছে, কেউ টাকা-পয়সার

---

[72] ইবন তাইমিয়ার ফাতওয়া সংকলন ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’: ২২/৬০৫।

[73] ইবন রজব প্রণীত ‘আল-খুশু ফিস সালাত’: ২৭-২৮।

[74] মুহাম্মাদ ইবন নাসর আল-মারওয়াযি সংকলিত ‘তাযিমু কাদরিস সালাত’: ১/৫৮।

[75] মার‘ঈ আল-কারমি প্রণীত ‘আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ ফি মানাকিবিল মুজতাহিদ ইবন তাইমিয়াহ’: পৃ.৮৩। দারুল গারব আল-ইসলামি।

হিসেব কষছে, কেউ মুসল্লা বা মসজিদের শৈল্পিক কারুকার্য নিয়ে গবেষণা করছে, আবার কেউ পাশের লোকের পরিচয় জানতে চেষ্টা করছে। এভাবেই সালাতে দাঁড়িয়ে একেকজন একেক ব্যস্ততায় থাকে। আপনি কি মনে করেন, তারা কেউ দুনিয়ার কোনো বাদশাহর সামনে দাঁড়ালে এর একটি কাজ করতে সাহস পেত?

১৬. সালাতে খুশু ও একাগ্রতা হাসিল করার মর্ম, তাৎপর্য, ফযীলত ও উপকারিতা জানা, যেমন (ক). একাগ্রতার ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله».

“এমন কোনো মুসলিম নেই যার ফরয সালাত উপস্থিত হয়, তারপর সে সুন্দরভাবে ওযু করে, সুন্দরভাবে সালাতের খুশু ও রুকু সম্পাদন করে, তবে অবশ্যই তার সালাত পূর্বের গুনাহের কাফফারা হবে, যদি কবিরা গুনাহে লিপ্ত না হয়। আর এটা জীবনভর।”[76]

(খ). আরো জানা যে, সালাতে একাগ্রতায় ঘাটতি হলে সাওয়াবেও ঘাটতি হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إن العبد ليصلي الصلاة ما يُكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها».

“বান্দা সালাত আদায় করে বটে, কিন্তু তার জন্যে সালাতের দশমাংশ, নবমাংশ, অষ্টমাংশ, সপ্তমাংশ, ষষ্ঠাংশ, পঞ্চমাংশ, চতুর্থাংশ, তৃতীয়াংশ ও অর্ধেক সাওয়াব ছাড়া বেশি লেখা হয় না।”[77]

(গ). আরো জানা যে, বুঝে ও সজ্ঞানে পড়লেই সালাতের ফযীলত হাসিল হয়, যেমন ইবন আব্বাস—রাদিয়াল্লাহু আনহুমা—থেকে বর্ণিত,

«ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها».

“যতটুকু সালাত তুমি বুঝে পড়বে তার বেশীর তুমি হকদার নও।”[78]

(ঘ). আরো জানা যে, পরিপূর্ণ খুশু ও একাগ্রচিত্তে আদায়কৃত সালাত দ্বারাই পাপ মোচন হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[76] সহীহ মুসলিম: ১/২০৬, হাদীস নং ২/৪/৭।

[77] ইমাম আহমদ সংকলিত ‘মুসনাদ’: ৪/৩২১; ‘সহীহ আল-জামি’, হাদীস নং ১৬২৬।

[78] আলবানি সংকলিত ‘সিলসিলাহ দাঈফাহ’, হাদীস নং ৬৯৪১। অনুবাদক।

«إن العبد إذا قام يصلي أُتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه».

“বান্দা যখন সালাত পড়তে দাঁড়ায় তখন তার সকল পাপ এনে তার মাথা ও কাঁধের উপর রাখা হয়। তারপর যখন রুকু বা সাজদাহ করে তার পাপগুলো একেক করে ঝরে পড়ে।”[79]

মুনাওয়ি রহ. বলেন, “হাদীসটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন মুসল্লি একটি রুকন ভালোভাবে সম্পন্ন করে তখন তার গুনাহের একটি অংশ ঝরে পড়ে। যখন সালাত শেষ হয় তখন তার গুনাহও শেষ হয়। এ ফযীলত কেবল সে সালাতের জন্যেই, যা সকল শর্ত ও রুকনসহ একাগ্রচিত্তে সম্পন্ন করা হয়। কারণ, হাদিসে উল্লিখিত দু’টি শব্দ ‘আবদ’ ও ‘কিয়াম’ আল্লাহর সামনে বিনয় ও একাগ্রচিত্তে দাঁড়ানোকে দাবি করে।”[80]

(ঙ). ইবনুল কাইয়্যেম রহ.-এর কথাগুলো স্মরণ করা যে, “সালাত আদায়কারী যখন একাগ্রচিত্তে সালাত শেষ করে তখন সে নিজেকে ভারমুক্ত অনুভব করে, যেন তার ওপর থেকে বোঝা নামানো হয়েছে, ফলে সে কাজে-কর্মে তৃপ্তি, প্রশান্তি ও ফুরফুরে মেজাজ উপলব্ধি করে। আর আক্ষেপ করে, যদি সালাতেই থাকতাম! কারণ, সালাত তার চোখের শীতলতা, রূহের সজীবতা, অন্তরের জান্নাত ও পার্থিব জগতে শান্তির নিরাপদ স্থান। যতক্ষণ না পুনরায় সালাতে প্রবেশ করে নিজেকে জেলখানা ও সংকীর্ণ স্থানে বন্দী ভাবে। বস্তুত, এরূপ মুসল্লিই সালাতের দ্বারা প্রশান্তি অর্জন করে, ফলে সে সালাত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না। আল্লাহকে মহব্বতকারীরা বলেন: আমরা সালাতে স্বস্তি পাই, তাই সালাত আদায় করি, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, «يا بلال أرحنا بالصلاة» ‘হে বেলাল, সালাতের দ্বারা আমাদের স্বস্তি দাও।’ তিনি বলেন নি, সালাত থেকে স্বস্তি দাও। তিনি আরো বলেছেন, «جعلت قرة عيني بالصلاة» ‘আমার চোখের শীতলতা করা হয়েছে সালাতে।’ অতএব, যার চোখের শীতলতা সালাতে, সে কীভাবে সালাত ছাড়া শান্তি পায় এবং কীভাবে সালাত ছাড়া থাকতে পারে?”[81]

১৭. সালাতে দো‘আর জায়গাগুলোতে খুব দো‘আ করা, বিশেষভাবে সাজদায়। কারণ, আল্লাহর সমীপে বিনীত হয়ে দাঁড়ানো, তার কালাম তিলাওয়াত করা, তার নিকট দো‘আ ও আকুতি পেশ করা আল্লাহর সাথে বান্দার ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে দেয়, ফলে তার খুশু ও একাগ্রতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু দো‘আ তো ইবাদত, আল্লাহ বান্দাকে দো‘আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন,

---

[79] ইমাম বায়হাকি সংকলিত ‘আস-সুনানুল কুবরা’: ৩/১০, দেখুন সহীহ আল-জামি।

[80] ইমাম বায়হাকি সংকলিত ‘আস-সুনানুল কুবরা’: ৩/১০; ইমাম মুনাভি প্রণীত ‘জামি সাগিরে’র ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘ফয়যুল কাদির’: ২/৩৬৮।

[81] ইবনুল কাইয়্যেম প্রণীত ‘আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব’: ৩৭।

যেমন তিনি বলেছেন:

﴿ ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةًۚ ٥٥ ﴾ [الاعراف: ٥٥]

"তোমরা তোমাদের রবকে অনুনয় বিনয় ও চুপিসারে ডাক।" [সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৫৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, «من لم يسأل الله يغضب عليه» "যে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে না আল্লাহ তার প্রতি নারাজ হন।"[82]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সালাতের বিভিন্ন জায়গায় পঠনীয় অনেক দো'আ প্রমাণিত আছে, যেমন সাজদায়, দুই সাজদার মাঝখানে ও তাশাহহুদ শেষে, তবে দো'আর গুরুত্বপূর্ণ স্থান সাজদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء».

"বান্দা তার রবের অতি নিকটবর্তী হয় যখন সে সাজদায় থাকে, অতএব তোমরা অনেক দো'আ কর।"[83] তিনি আরো বলেছেন,

«أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمَن- أي حريّ وجدير -أن يُستجاب لكم».

"সাজদায় তোমরা খুব দো'আ কর, কারণ তোমাদের ডাকে সাড়া দেওয়ার উপযুক্ত স্থান সাজদা।"[84]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদায় অনেক দো'আ করতেন, কয়েকটি দো'আ নিম্নরূপ:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ سِرَّهُ وَعَلانِيَتَهُ».

"হে আল্লাহ, আমার ছোট ও বড়, প্রথম ও শেষের, গোপন ও প্রকাশ্যের সকল পাপ মাফ কর।"[85] কখনো বলতেন:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ».

"হে আল্লাহ, আমি যা আড়াল করেছি এবং যা প্রকাশ করেছি সব তুমি ক্ষমা কর।"[86]

---

[82] তিরমিযী, ১/৪২৬; আলবানি সহীহ তিরমিযীতে হাদীসটি হাসান বলেছেন। হাদিন নং ২৬৮৬।

[83] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৫।

[84] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৭।

[85] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৬।

[86] ইমাম নাসাঈ সংকলিত 'আল-মুজতাবা', হাদীস নং ২/৫৬৯; সহীহ নাসাঈ, হাদীস নং ১০৬৭।

দুই সাজদার মাঝে দো'আ করা। ইতোপূর্বে খুশু অর্জনের ১১নং উপায়ে দুই সাজদার মাঝে পঠনীয় কয়েকটি দো'আ উল্লেখ করেছি। আর তাশাহহুদ শেষে তিনি যেসব দো'আ পড়তেন, তার ভেতর কয়েকটি নিম্নরূপ:

«إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع؛ من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال».

"যখন তোমাদের কেউ তাশাহহুদ থেকে অবসর হবে, তখন আল্লাহর নিকট চারটি বস্তু থেকে পানাহ চাইবে: জাহান্নামের শাস্তি, কবরের আযাব, জীবন-মৃত্যুর ফিতনা ও মাসিহ দাজ্জালের অনিষ্ট।" কখনো তিনি বলতেন,

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ».

"হে আল্লাহ, আমি যা করেছি এবং যা করি নি তার অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট পানাহ চাই।" কখনো তিনি বলতেন,

«اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَاباً يَسِيراً».

"হে আল্লাহ, আমার হিসেব সহজ কর।" তাশাহহুদ শেষে তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শিখিয়েছেন,

«اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ».

"হে আল্লাহ, আমি আমার নফসের উপর অনেক জুলম করেছি, আর আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না, অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ থেকে অনেক ক্ষমা করুন এবং আমাকে রহম করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক সাহাবীকে তাশাহহুদ শেষে বলতে শুনলেন,

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا أَللَّهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»

"হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ, আপনি নিশ্চয় এক, একক ও অমুখাপেক্ষী। যিনি জন্ম দেননি এবং যাকে জন্ম দেওয়া হয় নি এবং কেউ তার সমকক্ষ নয়। আপনি আমার পাপসমূহ ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

তারপর তাকে লক্ষ্য করে বললেন, সে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়েছে, সে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়েছে।

অপর ব্যক্তিকে তিনি তাশাহহুদ শেষে বলতে শুনলেন,

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لك الْمَنَّانُ يا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ».

"হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি যে, আপনার জন্যেই সকল প্রশংসা। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আপনি এক, আপনার কোনো শরীক নেই। আপনি অনুগ্রহকারী, হে আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা। হে মর্যাদার অধিকারী ও সম্মানিত। হে চিরঞ্জীব ও চির প্রতিষ্ঠিত, আমি আপনার নিকট জান্নাত চাই ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

তারপর তিনি সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা জান সে কীসের মাধ্যমে দো'আ করেছে? তারা বলল, আল্লাহ ও তার রাসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন:

«والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سُئل به أعطى».

"সে সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার নফস, সে ইসমে-আযম অর্থাৎ আল্লাহর মহান নামের উসিলায় দো'আ করেছে, যে নামের উসিলায় দো'আ করলে তিনি সারা দেন, আর প্রার্থনা করলে প্রার্থিত বস্তু প্রদান করেন।"

নাসিরুদ্দিন আলবানি রহ. 'সিফাতুস সালাত' গ্রন্থে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সর্বশেষ বলতেন:

«اللَّهُمَّ اغفرلي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت».

"হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, যা আগে প্রেরণ করেছি ও যা পরে প্রেরণ করেছি এবং যা গোপন করেছি ও যা প্রকাশ করেছি। আর যা আপনি আমার চেয়েও বেশি জানেন। আপনি প্রথম এবং আপনি সর্বশেষ। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।"

বিশেষ জ্ঞাতব্য: এ দো'আ ও বইটিতে উল্লিখিত অন্যান্য দো'আর সূত্র ও বিস্তারিত তথ্য জানার জন্যে নাসিরুদ্দিন আলবানি রহ. রচিত 'সিফাতুস সালাত' গ্রন্থটি দেখুন।

যেসব মুসল্লি ইমামের পেছনে তাশাহহুদ শেষে চুপচাপ বসে থাকেন, তারা এসব দো'আ মুখস্থ করে তখন পড়তে পারেন। বস্তুত, সালাতের বিভিন্ন জায়গায় পঠনীয় একাধিক দো'আ যারা জানেন না ইমামে পেছনে তাদের চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া কিছু করার থাকে না। এ সময় শয়তান ওয়াসওয়াসা দিতে বেশি সমর্থ হয়, তাই তাশাহহুদ শেষে পড়ার জন্যে বেশ বিশুদ্ধ কিছু দো'আ মুখস্থ রাখা বাঞ্ছনীয়।

১৮. সালামের পর মাসনুন দো'আসমূহ মনোযোগ দিয়ে পড়া। কারণ, মাসনুন দো'আর ফলে অন্তরের একাগ্রতা, সালাতের বরকত ও তার ফায়দা দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়। জ্ঞাতব্য যে, পূর্বের ইবাদতের সুরক্ষা ও তার হিফাজতের স্বার্থে পরবর্তী ইবাদত আঞ্জাম দেওয়া জরুরি। এ সূত্রে সালাতের পরবর্তী ইবাদত মাসনুন দো'আ ও যিকর। লক্ষ্য করুন, যিকিরসমূহের প্রথমে আছে তিনবার ইস্তেগফার। তার অর্থ হচ্ছে, মুসল্লি তার রবের নিকট সালাতের ত্রুটি ও তাতে খুশুর ঘাটতি পুষিয়ে নিতে রবের নিকট ক্ষমা চাইছে। অনুরূপভাবে বেশিবার নফল সালাত আদায় করার বিষয়টিও তেমন। কারণ, নফল সালাত দ্বারা ফরয সালাতের রুকনের ত্রুটি ও তার খুশুর ঘাটতির প্রতিকার করা হবে।

এ পর্যন্ত আমরা খুশু ও একাগ্রতার সহায়ক করণীয় উপায় নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার আমরা তার প্রতিবন্ধক বর্জনীয় উপকরণ নিয়ে আলোচনা করব।

দ্বিতীয়ত, একাগ্রতা বিনষ্টকারী উপকরণসমূহ

১৯. যেসব বস্তু দ্বারা মুসল্লির একাগ্রতা বিনষ্ট হয় সেগুলো সালাতের জায়গা থেকে দূর করা। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা—র 'কিরাম' ছিল, অর্থাৎ নকশি কাপড় ছিল, কারো মতে 'কিরাম' অর্থ রঙ্গিন কাপড়, সেটা দিয়ে তিনি ঘরের এক পাশ ঢেকে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«أميطي- أزيلي -عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي».

'এটা আমার কাছ থেকে দূরে সরাও, কারণ তার ছবিগুলো আমার সালাতে ভেসে উঠছিল।"[87]

আবুল কাসিম রহ. বলেন, "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে ছবিযুক্ত একটা রঙিন কাপড় ছিল, সেটা তিনি ছোট রোম সৃষ্টিকারী ঘরের মাঝের (পার্টিশনের) দেয়ালের সঙ্গে টাঙ্গিয়ে রেখেছিলেন, যে দিকে ফিরে সালাত পড়তেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। একদা তিনি বললেন,

«أخّريه عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي فأخرته فجعلته وسائد».

'এটা আমার থেকে পেছনে হটাও, কারণ তার ছবিগুলো আমার সালাতে ভেসে উঠছিল, ফলে আয়েশা সেটা পেছনে সরিয়ে নেন এবং তা দিয়ে বালিশ তৈরি করেন।"[88]

একই অর্থের আরেকটি ঘটনা, আবু দাউদ রহ. বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[87] সহীহ বুখারির ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফতহুল বারি': ১০/৩৯১।

[88] সহীহ মুসলিম: ৩/১৬৬৮।

যখন সালাত পড়ার জন্যে কা'বায় প্রবেশ করেন, সেখানে তিনি ভেড়ার দু'টি শিং দেখতে পান, সালাত শেষ করে উসমান আল-হাজাবিকে বলেন,

«إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي».

'আমি তোমাকে শিং দু'টি ঢেকে রাখার হুকুম দিতে ভুলে গিয়েছি। মনে রেখ, কাবার ভেতর এমন জিনিস থাকা বাঞ্ছনীয় নয় যা মুসল্লিকে অন্যমনস্ক করে।"[89]

মানুষের চলাচলের জায়গা, শোরগোলের স্থান, বিরক্তিকর শব্দ, গল্পকারদের আড্ডা, গান-বাজনার আসর ও নজর কাড়া দৃশ্যের দিকে ফিরে সালাত আদায় করা ঠিক নয়। সম্ভবপর হলে প্রচণ্ড গরম ও কনকনে শীতের স্থান থেকে সরে সালাত আদায় করা। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরমের জন্যে যোহর সালাত ঠাণ্ডা করে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "প্রচণ্ড গরম মুসল্লির খুশু ও একাগ্রতা দূর করে দেয় এবং তাতে সে অপ্রসন্ন ও অনীহাভাব নিয়ে ইবাদত করে। তাই শরীয়ত প্রণেতা বিশেষ হিকমতবশত প্রচণ্ড গরমে দেরি করে সালাত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, যেন গরম পড়ে যায় এবং মুসল্লি অন্তর নিয়ে সালাত পড়তে সমর্থ হয়, তবেই সালাতের বিশেষ উদ্দেশ্য অর্থাৎ খুশু ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ মনোযোগ হাসিল হবে।"[90]

২০. যেসব কাপড়ে নকশা, লেখা, ক্যালিগ্রাফি, বিভিন্ন রঙ বা ছবি রয়েছে, যা মুসল্লিকে অন্যমনস্ক করে, সেগুলো গায়ে জড়িয়ে সালাত আদায় না করা। ইমাম মুসলিম বর্ণিত হাদীসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা ছবিযুক্ত 'খামিসায়' অর্থাৎ সেলাই করা চতুষ্কোণ বিশিষ্ট ছবিযুক্ত কাপড়ে সালাত পড়তে দাঁড়ালেন, কাপড়ের ছবিতে তার চোখ আটকে গেল, তাই সালাত শেষে বললেন,

«اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة و أتوني بأنبجانيّه -كساء ليس فيه تخطيط ولا تطريز ولا أعلام-، فإنها ألهتني آنفًا في صلاتي». «وفي رواية» :«شغلتني أعلام هذه». «وفي رواية: «كانت له خميصة لها علم، فكان يتشاغل بها في الصلاة».

'তোমরা কাপড়টা আবু জাহাম ইবন হুযায়ফার কাছে নিয়ে যাও এবং একটা আনবিজানিয়া অর্থাৎ কারুকার্য বিহীন সাদাসিদে কাপড় নিয়ে আস। কারণ, এক্ষণে এটা আমাকে আমার সালাতে অন্যমনস্ক করে দিয়েছে।' অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, 'এটার নকশাগুলি

---

[89] আবু দাউদ, হাদীস নং ২০৩০। 'সহীহ আল-জামি', হাদীস নং ২৩০৪।

[90] ইবনুল কাইয়্যেম 'আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব': পৃ.২২; দারুল বায়ান প্রকাশিত।

আমাকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছে।’ অপর বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা বলেন, ‘তার নকশাওয়ালা একটা কাপড় ছিল, সালাতে সেটা নিয়ে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে যান।”[91]

অতএব যেসব কাপড়ে ছবি রয়েছে, বিশেষত প্রাণীর ছবি, তাতে সালাত আদায় না করা, বর্তমান যুগে যা মহামারির আকার ধারণ করেছে।

২১. যদি খাবার সামনে উপস্থিত হয় এবং তার প্রতি মনের আকর্ষণ থাকে, তাহলে আগে খাবার খেয়ে নেওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا صلاة بحضرة طعام».

“খাবারের উপস্থিতিতে কোনো সালাত নেই।”[92]

অতএব যদি খাবার পেশ করা হয়, আগে তার থেকে অবসর হওয়া সালাতে একাগ্রতা অর্জনের জন্যে সহায়ক। কারণ, খাবার রেখে সালাত পড়লে একাগ্রতা নষ্ট হয়। এমতাবস্থায় মুসল্লি সালাত পড়বে ঠিক কিন্তু তার নফস থাকবে খাবারে, তাই প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার গ্রহণ করে সালাত আদায় করাই শ্রেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إذا قرِّب العَشاء وحضرت الصلاة، فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. ولا تعجلوا عن عشائكم». «
وفي رواية» :«إذا وُضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجلنّ حتى يفرغ منه».

“যদি রাতের খাবার পরিবেশন করা হয় আর সালাতও হাজির হয়, তবে মাগরিবের সালাতের আগে খাবার খেয়ে নাও। আর তাড়াহুড়ো করো না।” অন্য বর্ণনায় এসেছে, “যখন তোমাদের কারো খাবার রাখা হয় আর সালাতের ইকামতও আরম্ভ হয়, তাহলে আগে খাবার খেয়ে নাও এবং প্রয়োজন শেষ না হতে খাবার থেকে উঠবে না।”[93]

২২. পেশাব-পায়খানা চেপে সালাত না পড়া। কারণ, পেশাব-পায়খানার চাপ সালাতের একাগ্রতা দূর করে দেয়। এ জন্যেই হাদীসে এসেছে,

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو حاقن».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিকে পেশাব-পায়খানা চেপে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।”[94]

---

[91] সহীহ মুসলিম: ১/৩৯১, হাদীস নং ৫৫৬। সবক’টি বর্ণনা সহীহ মুসলিম থেকে গৃহীত।

[92] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৬০।

[93] সহীহ বুখারি, আযান অধ্যায়; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৫৯, ৫৫৭।

[94] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৬১৭। ‘সহীহ আল-জামি’, হাদীস নং ৬৮৩২।

অতএব কেউ যদি পেশাব-পায়খানার চাপ অনুভব করে আগে তার থেকে অবসর হবে, জামাতের যতটুকু ছুটে যায় যাক। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء».

“তোমাদের কেউ যখন বাথরুমে যাওয়ার ইচ্ছা করে, আর সালাতও দাঁড়িয়ে যায়, সে আগে বাথরুম সারবে।”[95]

উপরন্তু সালাতের মাঝেও যদি পেশাব-পায়খানার বেগ হয় সালাত ছেড়ে দিবে, তারপর ওযু করে সালাত পড়বে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان».

“খাবারের উপস্থিতিতে ও পেশাব-পায়খানা চেপে কোনো সালাত নেই।”[96] উল্লেখ্য যে, বায়ু চেপে রাখাও বাথরুম চেপে রাখার ন্যায় একাগ্রতার বিপরীত, তাই বায়ু চেপেও সালাত আদায় করবে না।

২৩. তন্দ্রার ভাব নিয়ে সালাত আদায় না করা। আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقول».

“যখন তোমাদের কেউ সালাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় তখন ঘুমিয়ে নিবে, যতক্ষণ না সে যা বলে তা বুঝতে পারে।”[97]

অর্থাৎ প্রয়োজন অনুপাতে ঘুমিয়ে তন্দ্রা দূর করে সালাত পড়বে। এর কারণ বর্ণিত হয়েছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إذا نعس أحدكم و هو يصلي فليرقد، حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه».

“যখন তোমাদের কেউ সালাতে ঝিমোয়, তখন সে শুয়ে পড়বে, যতক্ষণ না তার ঘুম চলে যায়। কেননা, তোমাদের কেউ যখন তন্দ্রার অবস্থায় সালাত পড়বে, তখন সে বলতে পারবে

---

[95] আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৮; ‘সহীহ আল-জামি’, হাদীস নং ২৯৯।

[96] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৬০।

[97] সহীহ বুখারি, হাদীস নং ২১০।

না, হয়তো ইস্তেগফার করতে গিয়ে নিজেকে গালি দিবে।”[98]

ইবন হাজার বলেন, “কিয়ামুল লাইলে অনেক সময় এরূপ হয়। তখন দো‘আ কবুলের মুহূর্তে নিজের অজান্তে নিজেকে বদ দো‘আ করবে হয়তো। এ হাদীস ফরয সালাতকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যদি সময় শেষ হওয়ার আশঙ্কা না হয় ফরয সালাতও তখন আদায় করবে না।”[99]

২৪. ঘুমন্ত ব্যক্তি বা গল্পকারদের পেছনে সালাত আদায় না করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث».

“তোমরা ঘুমন্ত ও আলাপীর পেছনে সালাত পড় না।”[100]

অর্থাৎ মুসল্লি যদি আলাপীর পশ্চাতে সালাত পড়ে, তাহলে স্বভাবত সে তাকে আলাপ দ্বারা অন্যমনস্ক করতে পারে। অনুরূপ ঘুমন্ত ব্যক্তি হতে অযাচিত কিছু প্রকাশ পেলে তার একাগ্রতা নষ্ট হতে পারে।

খাত্তাবি রহ. বলেন, “ইমাম শাফি ও আহমদ ইবন হাম্বল বলেছেন আলাপীর দিকে ফিরে সালাত পড়া মাকরূহ। কারণ, আলাপীর আলাপ মুসল্লিকে সালাত থেকে গাফিল করে দেয়।”[101]

উল্লেখ্য যে, ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে সালাত পড়ার নিষেধাজ্ঞার দলিলগুলোকে অনেক আলেম দুর্বল বলেছেন, যেমন ইমাম আবু দাউদ ‘বিতর’ অধ্যায়ে এবং হাফিয ইবন হাজার ‘ফাতহুল বারি’-র ‘বাবুস সালাত খালফান নায়িম’ অনুচ্ছেদে।

ইমাম বুখারি রহ. তার সহীহ গ্রন্থে একটি অধ্যায় কায়েম করেছেন, ‘বাবুস সালাতি খালফান-নায়েম’ অর্থাৎ ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে সালাত পড়ার অধ্যায়। সেখানে তিনি আয়েশা—রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে উল্লেখ করেন,

«كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه».

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত পড়তেন, আর আমি তার শয্যায় বাধা হয়ে শুয়ে

---

[98] সহীহ বুখারি, হাদীস নং ২০৯।

[99] ইবন হাজার প্রণীত ‘ফাতহুল বারি’, শারহু কিতাবুল ওযু, বাবুল ওযু মিনান নাওম।

[100] আবু দাউদ, হাদীস নং ৬৯৪; ‘সহীহ আল-জামি’, হাদীস নং ৩৭৫। আলবানি হাদীসটি হাসান বলেছেন।

[101] শারফুল হক আযিম আবাদি প্রণীত আবু দাউদের ব্যাখ্যা: ‘আওনুল মাবুদ: ২/৩৮৮।

থাকতাম।"[102]

ইমাম মালিক, মুজাহিদ, তাউস প্রমুখ ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে সালাত পড়াকে মাকরূহ বলেছেন, কারণ, হয়তো তার কাছ থেকে লজ্জাকর কিছু প্রকাশ পাবে, যা মুসল্লিকে তার সালাত থেকে অন্যমনস্ক করবে।[103] এরূপ আশঙ্কা না থাকলে ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে সালাত পড়া মাকরূহ নয়।

২৫. সালাত পড়াবস্থায় সাজদার জায়গার ধুলো-বালি সমতল না করা। ইমাম বুখারি সাহাবী মুআইকিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদার স্থানের মাটি সমতলকারীকে বলেছেন, «إن كنت فاعلاً فواحدة» "যদি তোমাকে করতেই হয় তাহলে একবার।"[104] তিনি আরো বলেছেন,

«لا تمسَح وأنت تصلي فإن كنتَ لا بدّ فاعِلا فواحدة».

"তুমি সালাত পড়াবস্থায় সাজদার জায়গা মুছবে না, যদি মুছতেই হয় তাহলে একবার।"[105]

সালাতের একাগ্রতা ঠিক রাখা ও তাতে অহেতুক হরকত কম করার স্বার্থেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ নিষেধাজ্ঞা। আর যদি সাজদার জায়গা সমতল করতে হয় সালাতের পূর্বেই করে নিবে। কপাল ও নাক পরিষ্কার করার ক্ষেত্রেও একই বিধান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও মাটি ও পানির উপর সাজদাহ করেছেন, যার আলামত তার চেহারায় সালাত শেষে দেখা গেছে, তিনি সাজদাহ থেকে উঠার সময় তা ঝেড়ে পরিষ্কার করেন নি। সত্যিকার অর্থে সালাতের খুশু ও একাগ্রতা কপালের ধুলো-ময়লা ভুলিয়ে দেয়। এ জন্যেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, «إن في الصلاة شغلاً» "নিশ্চয় সালাতে ব্যস্ততা রয়েছে।"[106]

ইবন হাজার বলেন, "ইবন আবি শায়বাহ রহ. স্বীয় 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, 'আরবদের সবচেয়ে প্রিয় লাল উটের বিনিময়েও সালাত পড়াবস্থায় সাজদার জায়গা হতে ধুলো-বালি সরানো পছন্দ করি না।' কাযী ইয়াদ্ব রহ. বলেন, 'সালাফগণ সালাত শেষ না করে কপাল মুছা পছন্দ করতেন না।"[107]

২৬. সূরা-কিরাত উচ্চস্বরে পড়ে অন্যদের সালাত নষ্ট না করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[102] সহীহ বুখারি, সালাত অধ্যায়।

[103] ইবন হাজার প্রণীত 'ফাতহুল বারি', সালাত অধ্যায়।

[104] ইবন হাজার প্রণীত 'ফাতহুল বারি': ৩/৭৯।

[105] আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৪৬। 'সহীহ আল-জামি', হাদীস নং ৭৪৫২।

[106] সহীহ বুখারি, দেখুন 'ফতহুল বারি': ৩/৭২।

[107] ইবন হাজার প্রণীত 'ফতহুল বারি': ৩/৭৯।

ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضًا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة». أوقال: «في الصلاة».

"স্মরণ রেখ! তোমরা প্রত্যেকে তার রবের সাথে কথোপকথন কর। খবরদার, একে অপরকে কষ্ট দিবে না এবং কিরাতের সময় কেউ কারো উপর আওয়াজ উঁচু করবে না।" অথবা বলেছেন, "সালাতের সময়...।"[108] অপর বর্ণনায় এসেছে,

«لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن»

"কুরআন নিয়ে তোমাদের কেউ কারো উপর আওয়াজ উঁচু করবে না।"[109]

সালাতে এদিক সেদিক তাকানোর বিধান

২৭. সালাতে এদিক সেদিক না তাকানো। আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه».

"বান্দা যতক্ষণ তার সালাতে থাকে আল্লাহ তার দিকে মনোনিবেশ করেই থাকেন, যতক্ষণ না সে এদিক সেদিক তাকায়, যখন সে এদিক সেদিক তাকায় তিনি তার থেকে ঘুরে যান।"[110]

সালাতে ইলতিফাত বা এদিক সেদিক তাকানো দুই প্রকার: (ক). অন্তরের ইলতিফাত অর্থাৎ অন্তরের আল্লাহ ছাড়া অন্য বস্তুর দিকে মনোনিবেশ করা। (খ). চোখের ইলতিফাত অর্থাৎ চোখের সাজদার জায়গার বাইরে দেখা। উভয় ইলতিফাত নিষেধ, কারণ এতে মুসল্লির সাওয়াব নষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলতিফাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি উত্তরে বললেন,

«اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد».

"এটা এক ধরণের ছিনতাই, যা বান্দার সালাত থেকে শয়তান ছিনিয়ে নেয়।"[111]

ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, "আমরা সালাত পড়াবস্থায় চোখ বা অন্তর দিয়ে যে এদিক সেদিক

---

[108] আবু দাউদ, হাদীস নং ২/৮৩, 'সহীহ আল-জামি', হাদীস নং ৭৫২।

[109] ইমাম আহমদ সংকলিত 'মুসনাদ': ২/৩৬; 'সহীহ আল-জামি', হাদীস নং ১৯৫১।

[110] আবু দাউদ, হাদীস নং ৯০৯, সহীহ আবু দাউদেও হাদীসটি আছে।

[111] সহীহ বুখারি, আযান অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: আল-এলতেফাত ফিস সালাত।

দেখি, তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মতো, যাকে কোনো বাদশাহ ডেকে এনে সামনে দাঁড় করিয়ে কথা বলেন ও সম্বোধন করেন, আর সে বাদশাহকে ত্যাগ করে ডানে-বামে দেখে, অন্তরও ফিরিয়ে নেয় তার থেকে, ফলে বাদশাহ তাকে যা বলেন তার কিছুই সে বুঝে না, কারণ তার অন্তর সাথে নেই। এ ব্যক্তি বাদশাহ থেকে কী আচরণ আশা করতে পারে? তার ক্ষেত্রে অন্তত এতটুকুন কী হবে না যে, বাদশাহর দরবারে সে অভিশপ্ত হবে এবং সেখান থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং বাদশাহের চোখে তার কোনো মূল্য থাকবে না? এ মুসল্লি কখনো ঐ মুসল্লির বরাবর নয়, যে পুরো সালাতে অন্তরসহ আল্লাহ-মুখী থাকে এবং তাঁর সমীপে দাঁড়িয়ে তাঁর বড়ত্ব অনুভব করে, ফলে তার অন্তর ভয়ে পরিপূর্ণ হয় ও শ্রদ্ধায় গর্দান সাজদায় ঝুঁকে যায়। লজ্জায় এদিক সেদিক তাকায় না এবং তার থেকে মনোযোগও হটায় না। এ দু'জনের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন হাস্‌সান ইবন আতিয়্যাহ। তিনি বলেন, দু'জন মুসল্লি একই সালাতে দণ্ডায়মান, অথচ উভয়ের মাঝে আসমান ও জমিনের মতো ব্যবধান। কারণ, একজন আল্লাহর প্রতি মনোযোগী আর অপরজন আল্লাহ হতে অন্যমনস্ক।"[112]

ইবন তাইমিয়াহ বলেন, "প্রয়োজন সাপেক্ষে এদিক সেদিক তাকানো নিষেধ নয়। আবু দাউদ রহ. বর্ণনা করেন, সাহাল ইবন হানযালিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'হুনাইনের যুদ্ধে ফজরের আযান হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামত করছিলেন আর পাহাড়ের পথে তাকাচ্ছিলেন।' আবু দাউদ বলেন, 'তার কারণ ছিল, রাতে পাহাড়ের পথে নজরদারির জন্যে জনৈক অশ্বারোহীকে তিনি প্রেরণ করেছিলেন, তাকে সালাতে দেখছিলেন।' এ ঘটনাটি সালাত পড়াবস্থায় উমামা তনয়া আবুল আসকে কোলে তুলে নেওয়া, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে দরজা খুলে দেওয়া, শেখানোর জন্যে সালাতেই মিম্বার থেকে নেমে আসা, সূর্য গ্রহণের সালাতে পেছনের দিকে প্রস্থান করা, শয়তান যখন তার সালাত নষ্ট করার চেষ্টা করছিল তখন তাকে আটকে গলা চেপে ধরা, মুসল্লিকে সালাতেই সাপ ও বিচ্ছু মারার অনুমতি দেওয়া, সালাতের সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে বাধা দিতে বলা—প্রয়োজনে তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার আদেশ করা, ইমামকে ভুল ধরিয়ে দিতে নারীদের হাতে হাত মেরে শব্দ করা, প্রয়োজন সাপেক্ষে ইশারা করা প্রভৃতি ঘটনার মতো। সালাতের বাইরে এসব অহেতুক কর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়, সালাতে ভেতর অবশ্যই বড় অপরাধ।"[113]

২৮. সালাতরত অবস্থায় মাথা উঁচিয়ে আসমানের দিকে না দেখা। এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং যে করবে তার প্রতি কঠোর হুশিয়ারি রয়েছে, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[112] ইবনুল কাইয়্যেম প্রণীত 'আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব': পৃ.৩৬, প্রকাশক, দারুল বায়ান।

[113] ইবন তাইমিয়ার ফাতওয়ার সংকলন 'মাজমুউল ফাতাওয়া': ২২/৫৫৯।

«إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء، أن يلتمع بصره».

“যখন তোমাদের কেউ সালাতে থাকে তখন আসমানের দিকে তাকাবে না, কারণ তার দৃষ্টি চলে যেতে পারে।”[114] অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন,

«ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم».

“মানুষের কী হলো, তারা সালাতে আসমানের দিকে দেখে? (অপর বর্ণনায় আছে, «عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة». ‘তিনি সালাতে দো‘আর সময় উপরে চোখ তুলতে নিষেধ করেছেন।’)[115] আরো কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, «لينتهنّ عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم». “অবশ্যই তার থেকে বিরত থাকবে অথবা তাদের দৃষ্টি ছিনিয়ে নেওয়া হবে।”[116]

২৯. সালাতে থাকাবস্থায় সম্মুখের দিকে থুতু না ফেলা। কারণ, সম্মুখে থুতু নিক্ষেপ করা একাগ্রতা ও আল্লাহর সাথে আদবের পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قِبَل وجهه فإن الله قِبَل وجهه إذا صلى».

“যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে, তখন সে নিজের চেহারার দিকে থুতু ফেলবে না। কারণ, যখন সে সালাত পড়ে তখন আল্লাহ তার চেহারার দিকে থাকেন।”[117] তিনি আরো বলেছেন,

«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله- تبارك و تعالى -ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكًا، و ليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها».

“যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায়, তখন সে নিজের সম্মুখে থুতু ফেলবে না। কারণ যতক্ষণ সে মুসল্লায় থাকে আল্লাহর সাথে কথা বলে এবং ডানেও থুতু ফেলবে না, কারণ ডানে মালাক (ফেরেশতা) আছেন, তবে তার বাঁয়ে ফেলবে বা পায়ের নিচে ফেলে মাটিতে চাপা দিবে।”[118] তিনি আরো বলেছেন,

[114] ইমাম আহমদ সংকলিত ‘মুসনাদ’: ৫/২৯৪; ‘সহীহ আল-জামি’, হাদীস নং ৭৬২।

[115] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪২৯।

[116] ইমাম আহমদ সংকলিত ‘মুসনাদ’: ৫/২৫৮; সহীহ আল-জামি, হাদীস নং ৫৫৭৪।

[117] সহীহ বুখারি, হাদীস নং ৩৯৭।

[118] সহীহ বুখারি বর্ণিত, দেখুন ‘ফাতহুল বারি’, হাদীস নং ৪১৬, ১/৫১২।

«إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن أحدكم في قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه».

"যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায়, তখন সে নিজের রবের সাথে কথা বলে। আর তার রব থাকেন কেবলা ও তার মাঝখানে, সুতরাং তোমরা কেউ কেবলার দিকে থুতু ফেলবে না, তবে বাঁয়ে বা পায়ের নিচে ফেলবে।"[119]

বর্তমান যেহেতু অধিকাংশ মসজিদ মোজাইক, টাইলস কিংবা কার্পেডিং করা, তাই প্রয়োজন সাপেক্ষে পকেট থেকে রুমাল বা রুমাল জাতীয় কাপড়-টিস্যু বের করে তাতে থুতু ফেলে পুনরায় তা পকেটে রেখে দেওয়া।

৩০. যথাসম্ভব সালাতে হাই তোলা দমন করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إذا تثاءَب أحدُكم في الصلاة فليكظِم ما استطاع فإن الشيطان يدخل».

"তোমাদের কেউ যখন সালাতে হাই তোলে, সে যেন তা যথাসাধ্য দমন করে। কারণ, শয়তান ভেতরে প্রবেশ করে।"[120]

জ্ঞাতব্য যে, শয়তান মুসল্লির ভেতর প্রবেশ করতে পারলে তার খুশু নষ্ট করতে বেশি সমর্থ হয়, আর বনু আদমের হাই তোলা দেখে তার খুশীতে আটখান হওয়া তো আছেই।

৩১. কোমরে হাত রেখে না দাঁড়ানো। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة».

"সালাতে কোমরে হাত রেখে দাঁড়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।"[121] কোমরে হাত দাঁড়ানোকে আরবিতে ইখতিসার বলা হয়।

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, "যিয়াদ ইবন সাবিহ হানাফি বলেন, আমি ইবন ওমরের পাশে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে সালাত পড়ছিলাম, আমার হাতে তিনি আঘাত করলেন এবং সালাত শেষ করে বললেন, সালাতে একেই শূলিবিদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো বলে, এভাবে দাঁড়াতে নবী সাল্লাল্লাহু

[119] সহীহ বুখারি বর্ণিত, দেখুন 'ফাতহুল বারি', হাদীস নং ৪১৭, ১/৫১৩।

[120] সহীহ মুসলিম: ৪/২২৯৩।

[121] আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৪৭। হাদীসটি সহীহ বুখারিতেও আছে।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করতেন।”[122]

একটি মারফু হাদিসে এসেছে, “জাহান্নামীরা কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিবে। আল্লাহর কাছে তার থেকে পানাহ চাই।”[123]

৩২. টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান না করা। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ‘সাদল’ থেকে ও পুরুষের মুখ ঢেকে রাখতে নিষেধ করেছেন।”[124]

খাত্তাবি রহ. বলেন, “গায়ের কাপড় মাটি স্পর্শ করা পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়াকে ‘সাদল’ বলা হয়।”[125]

মোল্লা আলি কারি ‘মিরকাত’ গ্রন্থে বলেন, “সাদল’ অর্থাৎ গায়ের কাপড় টাখনুর নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরিধান করা সর্বাবস্থায় নিষেধ। কারণ, ‘সাদল’ অহংকারের আলামত, সালাতে তা আরো খারাপ ও নিকৃষ্ট।’

‘আন-নেহায়া’ গ্রন্থকার বলেন, ‘সাদল’ হচ্ছে চাদর বা চাদর জাতীয় কাপড়ের দুই মাথা দিয়ে নিজেকে পেঁচিয়ে তার ভেতর থেকে দু’হাত বের করে রুকু ও সাজদাহ করা।’ কেউ বলেছেন: ‘ইয়াহূদীরা এরূপ করত।’ কেউ বলেছেন: ‘সাদল’ হচ্ছে মুসল্লির মাথা বা কাঁধের উপর কাপড় রেখে তার পার্শ্বগুলো তার সম্মুখে কিংবা তার দুই বাহুর উপর ঝুলিয়ে রাখা। এভাবে কাপড় গায়ে দিলে পুরো সালাত জুড়েই তা ঠিক করতে হয়, ফলে তার খুশু নষ্ট হয়। যদি কাপড় বাঁধা বা বোতাম লাগানো থাকে এ সমস্যা হয় না, আর তার খুশুতেও প্রভাব পড়ে না।’

বর্তমান যুগে কিছু কাপড় দেখা যায়, যেমন মরক্কোর আবাকাবা, এশিয়ার শাল বা চাদর, সৌদি আরবের রুমাল প্রভৃতি কাপড় পরিধান করে মুসল্লি যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন সালাত জুড়েই

---

[122] ইমাম আহমদ সংকলিত ‘মুসনাদ’: ২/১০৬, হাফিয ইরাকি ‘ইহইয়াউল উলুম’ গ্রন্থের তাখরিজে হাদীসটি সহীহ বলেছেন। দেখুন, আলবানির গবেষণা ‘আল-ইরওয়া’: ২/৯৪।

[123] ইমাম বায়হাকি আবু হুরায়রা থেকে হাদীসটি মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইরাকি বলেছেন, তার সনদ বাহ্যত সহি।

[124] আবু দাউদ, হাদীস নং ৬৪৩; আলবানি সংকলিত ‘সহীহ আল-জামি’, হাদীস নং ৬৮৮৩, তিনি হাদীসটি হাসান বলেছেন।

[125] মুহাম্মাদ শামসুল হক আল-আযিম আবাদি প্রণীত ‘আউনুল মাবুদ’: ২/৩৪৭।

পড়ে যাওয়া অংশ (আঁচল) উঠাতে ও গায়ে জড়াতে ব্যস্ত থাকে। অতএব সতর্ক হওয়া জরুরি।

আর মুসল্লির মুখ ঢাকার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে আলেমগণ বলেন, 'মুখ ঢাকা থাকলে সুন্দর তিলাওয়াত ও পূর্ণভাবে সাজদাহ করতে সমস্যা হয়।"[126] মোল্লা আলী কারী থেকে আহৃত অংশ শেষ হলো।

৩৩. সালাতে জীব-জন্তুর আকৃতি গ্রহণ না করা। আল্লাহ তা'আলা বনু আদমকে সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, কাজেই তাদের পক্ষে চতুষ্পদী জন্তুর সাদৃশ্য গ্রহণ করা শোভনীয় নয়। অধিকন্তু সালাতে কিছু জীব-জন্তুর হরকত ও আকৃতি গ্রহণ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, কেননা তার দ্বারা খুশু নষ্ট হয় কিংবা সেটা মুসল্লির অবস্থার সাথে বেমানান। যেমন বর্ণিত আছে,

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن ثلاث: عن نقر الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে তিনটি জিনিস নিষেধ করেছেন: কাকের ঠোকর, চতুষ্পদী জন্তুর বসা ও উটের ন্যায় একই জায়গা নির্ধারণ করা।"[127]

আহমদ সা'আতি বলেন, "হাদীসটি ব্যাখ্যা কেউ বলেছেন, একই স্থান নির্ধারণ করার অর্থ মসজিদের একটি জায়গা সালাতের জন্যে নির্ধারণ করা এবং সেটা পরিবর্তন না করা, যেমন উট তার বসার স্থান পরিবর্তন করে না।"[128] অপর বর্ণনায় আছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

«نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب».

"তিনি আমাকে মোরগের ঠোকরের ন্যায় ঠোকর, কুকুরের বসার ন্যায় বসতে ও শিয়ালের এদিক সেদিক তাকানোর ন্যায় তাকাতে নিষেধ করেছেন।"[129]

প্রিয় পাঠক, এ পর্যন্ত আমরা খুশু অর্জন করার উপায় ও তার বাধাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। উল্লেখ্য যে, খুশুর গুরুত্ব ও প্রয়োজনের তাগিদে আলেমগণ খুশু সংক্রান্ত নিম্নের বিষয়টি নিয়েও গবেষণা করেছেন:

---

[126] মোল্লা আলি আল-কারি প্রণীত 'মিরকাতুল মাফাতিহ': ২/২৩৬।

[127] ইমাম আহমদ সংকলিত 'মুসনাদ': ৩/৪২৮।

[128] আহমদ সাআতি প্রণীত 'আল-ফাতহুর রাব্বানি': ৪/৯১।

[129] ইমাম আহমদ সংকলিত 'মুসনাদ': ২/৩১১; 'সহীহ আত-তারগিব', হাদীস নং ৫৫৬।

খুশু বিহীন সালাতের হুকুম

মাসআলা: সালাতে যদি ওয়াসওয়াসার সংখ্যা বেশি হয়, তাহলে সালাত কি সহীহ আছে, না পুনরায় পড়তে হবে?

ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "যদি জিজ্ঞেস করা হয় খুশু বিহীন সালাতের বিধান কী, সহীহ কি সহীহ না?

এ জিজ্ঞাসার দু'টি উত্তর, (ক.) সাওয়াবের বিবেচনায়, (খ.) দুনিয়াবি বিধান মতে। (ক.) যদি জিজ্ঞাসা করা হয় সাওয়াবের বিবেচনায় সহীহ কি না, তার উত্তর হচ্ছে খুশু বিহীন সালাত সহীহ নয়। কারণ, মুসল্লি যে পরিমাণ সালাত বুঝে ও সজ্ঞানে পড়ে এবং যে পরিমাণ খুশু রক্ষা করে সে পরিমাণ তার সাওয়াব হয়।

ইবন আব্বাস বলেন: 'তোমার সালাতের তুমি ততটুকু হকদার যতটুকু সজ্ঞানে পড়েছ।' ইমাম আহমদের মুসনাদ গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত,

«إن العبد ليصلي الصلاة، و لم يكتب له إلا نصفها، أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها».

'বান্দা সালাত পড়ে বটে, তবে তার জন্যে সালাতের অর্ধেক বা তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ এমন কি দশমাংশ সাওয়াব ছাড়া কিছুই লেখা হয় না।' তাছাড়া মুসল্লির সফলতাকে আল্লাহ তা'আলা খুশুর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, তার অর্থ যার সালাত খুশু বিহীন সে সফল নয়। যদি খুশু বিহীন সালাত দুরস্ত হত, আল্লাহ তাকেও সফল বলতেন।

(খ.) আর যদি জিজ্ঞেস করা হয় দুনিয়াবি বিধান মতে সহীহ কি না, তার দ্বারা মুসল্লির ওয়াজিব আদায় হবে কি না? তাহলে কথা হচ্ছে, যদি খুশুর পরিমাণ বেশি হয় এবং মুসল্লি সজ্ঞানে সালাত পড়ে, সবার মতেই তার সালাত সহী। আর তার সালাতে যেসব ত্রুটি হয়েছে তার প্রতিবিধান করবে নফল সালাত ও সালাত পরবর্তী যিকিরসমূহ। আর যদি সালাতে খুশু বিহীন অংশ বেশি হয় এবং অধিকাংশ সালাত না বুঝে পড়ে, তাহলে পুনরায় তাকে সালাত পড়তে বলা হবে কি না ফকিহগণ ইখতিলাফ করেছেন। ইমাম আহমদের সাথী ইবন হামিদ বলেছেন খুশু ওয়াজিব। এ থেকে খুশু সম্পর্কে দু'টি মতের সৃষ্টি হয়েছে। দু'টিই ইমাম আহমদের মাযহাব। প্রথম মতের অনুসারী ইমাম আহমদের সাথী ইবন হামিদ বলেন, ওয়াসওয়াসার পরিমাণ বেশি হলে পুনরায় সালাত পড়া ওয়াজিব। দ্বিতীয় মতের অনুসারী অধিকাংশ ফকিহ বলেন ওয়াজিব নয়।

দ্বিতীয় মতাবলম্বীরা বলেন, সালাতে ভুল করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি ভুলের সাজদাহ করতে বলেছেন, পুনরায় পড়তে বলেন নি, যদিও একটা বড় ভুলের কথা তিনি নিম্নের হাদিসে বলেছেন,

«إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول: أذكر كذا، أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يُضل الرجل أن يدري كم صلى».

'নিশ্চয় শয়তান তোমাদের কারো সালাতে এসে বলে, এটা স্মরণ কর, এটা স্মরণ কর, যতক্ষণ না সে স্মরণ করবে। এভাবে এক সময় তাকে ভুলিয়ে দেয়, ফলে সে কত রাকাত পড়েছে বলতে পারে না।'

ফকিহদের ঐকমত্যে এরূপ সালাতের সাওয়াব নেই, তবে যতটুকু অংশ অন্তর ও খুশুসহ পড়েছে ততটুকু অংশের সাওয়াব হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، حتى بلغ عشرها».

'বান্দা সালাত শেষ করে বটে, কিন্তু তার জন্যে তার অর্ধেক, তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ, এমন কি দশমাংশ ছাড়া কোনো সাওয়াব লেখা হয় না।' ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها».

'তোমার সালাত থেকে তুমি ততটুকু হকদার যতটুকু তুমি বুঝেছ।'

অতএব শরীয়তের উদ্দেশ্য দেখে বিচার করলে খুশু বিহীন সালাত সহীহ নয়, যদিও আমরা সেটাকে এ অর্থে সহীহ বলি যে, পুনরায় পড়তে বলি না।"[130] ইবনুল কাইয়্যেম থেকে আহৃত অংশ শেষ হলো।

ইবনুল কাইয়্যেম অন্যত্র বলেন, "সহীহ গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত, তিনি বলেছেন,

«إذا أذن المؤذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا اذكر كذا، ما لم يكن يذكر، حتى يظل لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس».

"যখন মুয়াজ্জিন সালাতের আযান দেয় তখন শয়তান বায়ু ত্যাগ করতে করতে পালিয়ে যায়, যেন আযান শুনতে না পায়। যখন আযান শেষ হয় এগিয়ে আসে। আবার যখন ইকামত শুরু হয় পালিয়ে যায়, ইকামত শেষ হলে ফিরে আসে, এতটাই কাছে আসে যে, মুসল্লির নফসে ওয়াসওয়াসা দিতে সমর্থ হয় এবং বলে, এটা স্মরণ কর, এটা স্মরণ কর, যা পূর্বে স্মরণ করতে পারত না, যদ্দরুন এক সময় বলতে পারে না কত রাকাত পড়েছে। যখন তোমাদের

[130] ইবনুল কাইয়্যেম প্রণীত 'মাদারিজুস সালিকিন': ১/১১২।

কেউ এরূপ অনুভব করে তখন বসাবস্থায় দু’টি সাজদাহ করবে।

দ্বিতীয় মতের ফকিহরা আরো বলেন, যদি শয়তান মুসল্লিকে এতটাই গাফিল করে যে, কত রাকাত পড়েছে তাও ভুলে যায়, তবুও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দু’টি সাজদাহ করতে বলেছেন, দ্বিতীয়বার পড়তে বলেন নি। যদি তার সালাত বাতিল হত, যেরূপ আপনারা বলেন, তাহলে অবশ্যই তাকে পুনরায় সালাত পড়ার নির্দেশ দিতেন।

দ্বিতীয় মতের ফকিহরা আরো বলেন, এটাই সাহু সাজদার রহস্য, অর্থাৎ শয়তান বান্দাকে ধোঁকা দিয়ে, বান্দা ও তার সালাতের খুশু নষ্ট করে বাহ্যিকভাবে সামান্য সাফল্য লাভ করেও আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে লাঞ্ছিত হয়। এ জন্যেই সাহুর দু’টি সাজদাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঞ্ছিতকারী বলেছেন।”[131] আহৃত অংশ শেষ হলো।

অতএব যদি খুশুর ফল ও ফায়দা লাভ করার জন্যে মুসল্লিকে পুনরায় সালাত আদায় করতে বলা হয়, তবে সেটা তার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, সে চাইলে হাসিল করবে, অন্যথায় তার থেকে বঞ্চিত হবে। আর যদি পুনরায় পড়তে বলার অর্থ হয়, তাকে সালাত দোহরাতে বাধ্য করা, না পড়লে শাস্তি প্রদান করা ও তার উপর সালাত না পড়ার বিধান জারি করা, তাহলে আমরা সেটা মানতে নারাজ। দু’টি অভিমত থেকে দ্বিতীয় মতটি অধিক বিশুদ্ধ। আল্লাহ ভালো জানেন।

পরিশিষ্ট

খুশুর বিষয়টা খুব স্পর্শকাতর। আল্লাহর তাওফিক ছাড়া কারো পক্ষেই পুঙ্খানুপুঙ্খ খুশু অর্জন করা সম্ভবপর নয়। আবার খুশু থেকে বঞ্চিত হওয়াও বড় দুর্ভাগ্য। এ জন্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

«اللَّهُمَّ إِني أعوذ بك من قلب لا يخشع».

“হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে এমন অন্তর থেকে পানাহ চাই, যে ভীত হয় না (খুশু অর্জন করে না)।”[132]

সালাতে খুশু ও একাগ্রচিত্ত রক্ষা করা ও না-করার ভিত্তিতে মুসল্লিরা কয়েক শ্রেণীতে ভাগ হয়। কারণ, খুশু অন্তরের আমল, কখনো বাড়ে কখনো কমে। কারো খুশু আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়, আর কারো খুশু মাটি ভেদ করে আলোর মুখও দেখে না। কারণ, সে না বুঝে সালাত শুরু করেছে,

---

[131] ইবনুল কাইয়্যেম প্রণীত ‘মাদারিজুস সালিকিন’: ১/৫২৮-৫৩০।

[132] তিরমিযী, ৫/৪৮৫, হাদীস নং ৩৪৮২, সহীহ তিরমিযী, ২৭৬৯।

না বুঝেই তা শেষ করেছে, ফলে যেমন ছিল সালাতের পূর্বে তেমনই আছে তার পরে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, “খুশুর তারতম্য হিসেবে মুসল্লিরা পাঁচ ভাগে ভাগ হয়:

১. নিজের নফসের উপর জুলম ও সীমালঙ্ঘনকারী। অর্থাৎ সালাতের ওযু, সময়, সুন্নত ও রুকন সব ক্ষেত্রেই ত্রুটিকারী মুসল্লি।

২. মুসল্লি সালাতের সময়, সুন্নত, বাহ্যিক রুকন ও ওযুর হক আদায় করে বটে, কিন্তু নফসকে আয়ত্তে এনে তার ওয়াসওয়াসা দূর করতে অবহেলা করে। এরূপ মুসল্লি নফসের দাস, চিন্তা ও ওয়াসওয়াসার গোলাম।

৩. মুসল্লি সালাতের সকল সুন্নত ও রুকন ঠিকঠাক আদায় করে, অন্তরের ওয়াসওয়াসা ও নফসের কু-মন্ত্রণা দূর করতেও চেষ্টা করে এবং পুরো সালাতেই পাহারাদারিতে লিপ্ত থাকে, যেন তার সামান্য সাওয়াবও শয়তান চুরি করতে না পারে। এরূপ মুসল্লি জিহাদ ও সালাতে লিপ্ত।

৪. মুসল্লি সালাতের সকল হক, রুকন ও সুন্নত আদায় করে, অন্তরকেও তার সুরক্ষা ও হক আদায়ে লিপ্ত রাখে, যেন সামান্য সাওয়াবও নষ্ট না হয়, যথাযথভাবে সালাত আদায় ও পূর্ণ করতে চেষ্টার সেরাটা ব্যয় করে। এরূপ মুসল্লি সালাতভর খুশু ও রবের ইবাদতে মগ্ন।

৫. মুসল্লি উল্লিখিত ব্যক্তির ন্যায় সালাতের সব রুকন ঠিকঠাক আদায় করে, অধিকন্তু সে নিজের অন্তরকে ধরে এনে রবের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখে, অন্তর দিয়ে রবকে দেখে ও দেখার চেষ্টা করে। তার অন্তর রবের মহব্বত ও বড়ত্বে পরিপূর্ণ, প্রায় সে যেন রবকে দেখছে ও প্রত্যক্ষ করছে, ফলে তার কুমন্ত্রণা ও চিন্তাগুলো দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং তার ও তার রবের মধ্যকার বাধাগুলো সরে যায়। এরূপ মুসল্লি ও অন্যান্য মুসল্লির সালাতের মাঝে আসমান ও জমিনের পার্থক্য। কেননা, সে সালাতভর রবকে নিয়ে ব্যস্ত এবং তাকে নিয়েই পরিতৃপ্ত ছিল।

১ম প্রকার মুসল্লি শাস্তিযোগ্য; ২য় প্রকার জেরার সম্মুখীন; ৩য় প্রকার পাপ থেকে মুক্ত; ৪র্থ প্রকার সাওয়াবের যোগ্য; ৫ম প্রকার আল্লাহর নৈকট্য-প্রাপ্ত। পঞ্চম প্রকার মুসল্লি তাদের একজন, যারা সালাতকে নিজের চোখের শীতলতা বানিয়েছে। বলাই বাহুল্য দুনিয়াতে যার চোখ সালাতের দ্বারা শীতল হবে আখিরাতে তার চোখ রবের নৈকট্য পেয়ে শীতল হবে, অধিকন্তু দুনিয়াতেও শীতল হবে। আর যার চোখ রবকে দর্শন করে শীতল হবে তাকে দেখে শীতল হবে সকল চোখ। পক্ষান্তরে যে চোখ রব দ্বারা শীতল হবে না, সে চোখ হতাশার আঘাতে খণ্ডবিখণ্ড হবে।”[133] ইবনুল কাইয়্যেম থেকে আহৃত অংশ শেষ হলো।

---

[133] ইবনুল কাইয়্যেম প্রণীত ‘আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব’: পৃ.৪০।

সবশেষে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের খুশুওয়ালা বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমাদের উপর রহমতের দৃষ্টি দান করুন। অতঃপর যারা বইটি প্রচারে অংশ নিবে ও পাঠ করবে তাদের সবাইকে তিনি উপকৃত করুন ও উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন। আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

সমাপ্ত

সালাতে খুশু ও একাগ্রতার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তা‘আলা সালাত আদায়কারীর সফলতাকে একাগ্রতার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। অতএব, সফল সালাতের জন্যে একাগ্রতা পূর্বশর্ত। লেখক এ শর্ত সুরক্ষার জন্যে কীভাবে সালাতে একাগ্রতা অর্জন হয় এবং কী কারণে একাগ্রতা ভঙ্গ হয় প্রভৃতি বিষয়ের ওপর সুন্দর আলোচনা পেশ করেছেন বইটিতে।